নান্টুর মেলা দেখা

মঞ্জু সরকার

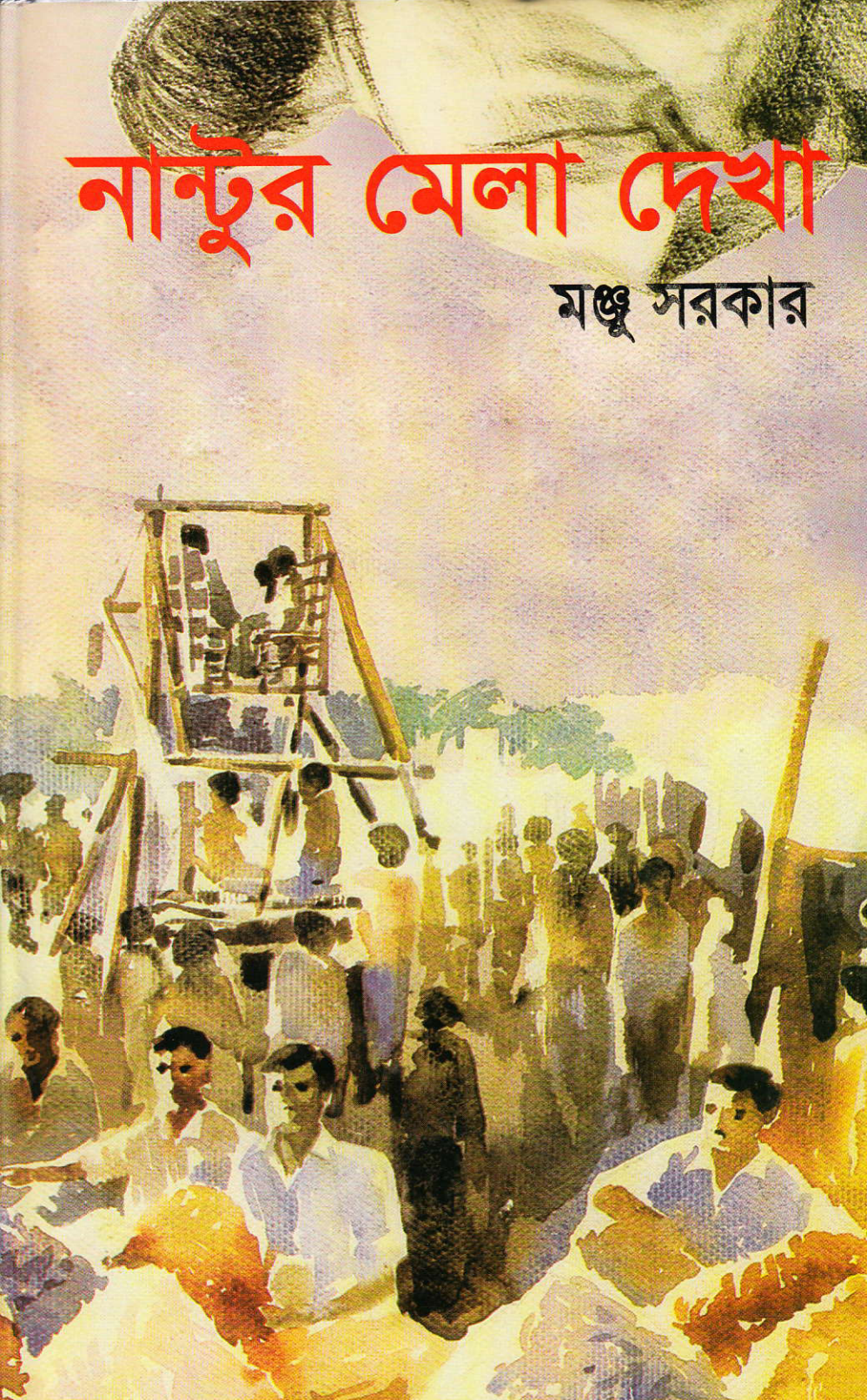

নান্টুর মেলা দেখা

মঞ্জু সরকার

সাহিত্য বিলাস

প্রকাশকাল
সাহিত্য বিলাস সংস্করণ:
একুশে বইমেলা-২০১২

প্রকাশক
শ. ম. গোলাম মাহবুব
সাহিত্য বিলাস
৩৮/৪, বাংলাবাজার
ঢাকা- ১১০০
ফোন : ০১৯১৭-৬৫১৬০৭

স্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ:
সমর মজুমদার

কম্পোজ
গ্যালাক্সী প্রিন্টার্স

মুদ্রণ
অক্ষর বিন্যাস প্রিন্টিং প্রেস
৫৯/৩, ইসলামপুর রোড, বাবুবাজার ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৭০.০০ টাকা মাত্র

ISBN 984 8708 12 X

NANTOOR MELA DEKHA By Manju Sarkar
Published by S. M. Golam Mahbub, Shahitya Bilash,
38/4, Banglabazar, 1st Floor, Dhaka-1100.
New Edition : February 2012
Cover Design: Samar Majumder
Price : Taka 70.00 Only
US$: 4.00 Only

নান্টু নতুনের কাঙাল। নিত্যনতুন কিছু দেখার জন্য ছটফট করে। চোখ দু'টি তার প্রজাপতির মতো। সারাক্ষণ উড়ে উড়ে বেড়াতে চায়। কিন্তু চোখের তো আর পাখা নেই। তাই পা দু'টিকে পাখার মতো দাপিয়ে বেড়ায়। দিনমান বাড়ির বাইরে ঘোরে সে। যখন ঘরে থাকে, তখনও চোখ তার গোটা গ্রামে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। রাতে ঘুমানোর জন্য চোখ বুজেও নান্টু মজাদার কত কী দেখে!

একদিন রাতে বিছানায় শুয়ে মাকে জিজ্ঞেস করল সে, বল তো মা, এখন কি দেখতে পাচ্ছি?

মা অবাক হয়ে বলল, চোখ বুজে মানুষ আবার কি দেখে! স্বপ্ন দেখছিস?

চোখ বন্ধ রেখেই নান্টু জবাব দিল, জেগে কেউ স্বপ্ন দেখে? আমি দেখতে পাচ্ছি একটা ঘুড্ডি। আকাশের অনেক উপরে উড়ছে। একটা উড়োজাহাজ এসে ঘুড্ডিটাকে ঠোকর দিল। এখন জাহাজটা ভেঙে পড়বে, নাকি ঘুড্ডিটা ছিঁড়ে যাবে মা?

মা হেসে বলল, বুঝেছি। কল্পনার চক্ষে এসব হাবিজাবি দেখছিস।

কিন্তু কল্পনার চোখে হাবিজাবি জিনিস দেখে নান্টুর মন ভরে না। সে সত্যি সত্যি দেখতে চায়। মাকে তাই আগাম জানিয়ে রাখল, এবার কান্দির মেলায় গিয়ে আমি একটা জাহাজ ঘুড্ডি কিনব মা।

মা বিরক্ত হয়ে বলল, ঠিক আছে কিনিস। এখন ঘুমো।

নান্টু কান্দির মেলার কথা ভাবতে লাগল। ভাবতেই কত মজা। কান্দির মেলায় যেতে পারলে নান্টুর খুশির সীমা থাকবে না। কারণ মেলা মানেই আনন্দ। মেলা মানেই দেখার মতো হরেকরকম মজার জিনিস। তার ওপর কান্দির মেলা হলো সবচেয়ে বড় মেলা। সেখানে দেখার মতো হাজার রকম নতুন জিনিস। ঈদের দিনে নতুন জামা গায়ে দিলে যেমন খুশি লাগে, নতুন কিছু দেখতে পেলে নান্টু খুশি হয় আরও বেশি।

কিন্তু গ্রামে দেখার মতো নতুন জিনিস আর কী আছে? নান্টু খুঁজে পায় না। গ্রামে যা কিছু সুন্দর, ভয়ঙ্কর এবং অদ্ভুত—নান্টু সবই দেখেছে। খেজুর গাছে ঝোলা বাবুই পাখির বাসায় লুকানো ডিম, পাখা না-গজানো চোখ না-ফোটা পাখির ছানা—কে দেখেছে? নান্টু দেখেছে। বিলে পানির নিচে ছোট মাছদের গোল্লাছুট খেলা, শোল মাছের ডিগবাজি—কে দেখেছে? নান্টু দেখেছে। বাড়ির পিছনে জঙ্গলের বাসিন্দা

শেয়াল, খরগোস, সাপ, বেজি–কে দেখেছে? নান্টু দেখেছে। বর্ষাকালে খুব জোরে মেঘ ডাকলে কিভাবে বাজ পড়ে; নান্টু জানে। তেঁতুল গাছে ভূতের হাসি কে শুনেছে? নান্টু শুনেছে। এমনকি ভেজা মাটিতে বাঘের পায়ের দাগ, নান্টু তা-ও দেখেছে। এতসব দেখে শুনে, দশ বছর বয়স না হতেই গ্রামটা নান্টুর কাছে খুব পুরনো আর একঘেয়ে হয়ে উঠেছে।

নান্টু নতুন জিনিস পেলে খুশি হয়। আব্বা তাই শহর থেকে একদিন নান্টুর জন্য দারুণ একটা নতুন জিনিস নিয়ে এলো। একটা নয়, আসলে তিনটা। জামা, জুতা এবং প্যান্ট। এমন সুন্দর জুতা ও জামা-প্যান্ট গাঁয়ের ছেলেরা পরেনি। দেখেও নি কেউ। নান্টু নিজেও এরকম জুতা আর ফুলপ্যান্ট পরেনি আগে। নতুন পোশাকের দিকে তাকিয়ে নান্টু চোখের পলক ফেলতে ভুলে গেল।

মা বলল, এমন দামী পোশাক কি গ্রামে মানায়? আপনার ছেলে যা দুষ্টু, দু'দিনে কাদামাটি লাগিয়ে শেষ করবে।

আব্বা বলল, এগুলো সব সময় পরার জন্য নয়। কোথাও বেড়াতে গেলে পরবে। আর বড় হয়েও যাতে পরতে পারে, সে জন্য একটু বড় দেখে নিয়েছি।

তার মানে নান্টু এগুলো এখন পরবে না? কবে সে বড় আর কখন বেড়াতে যাবে, তার জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হবে? ঈদের জামা আনলেও তো নান্টু ঈদ পর্যন্ত অপেক্ষা করে না। ঈদের আগেই চুপিচুপি একবার গায়ে দিয়ে দেখে নেয়, কেমন মানাচ্ছে। নান্টু তাই নতুন জামা জুতা পরার জন্য ছুলবুল করতে লাগল। জুতা নাকের কাছে নিয়ে বলল, ইহরে বাপ! কী সুন্দর গন্ধ। চামড়াটা আয়নার মতো চকচকে। মুখ দেখা যায়। আব্বা দেখ।

আব্বা হেসে বলল, হবেই তো। অনেক দাম যে।

মা নান্টুর খুশি দেখে নিজেও হেসে ফেলল। বলল, দে একটু পরিয়ে দেই। গায়ে হয় কি না দেখি।

মা প্রথমে জামাটা পরিয়ে দিল নান্টুকে। এটা জামা না কোট? চারটা পকেট। বোতামগুলো নীল। হাতা দু'টি বেশ বড়। মা তাই নিজে ভাঁজ করে গুটিয়ে দিল। প্যান্টের কোমরটা বেশি ঢিলে। খুলে পড়তে চায়। নান্টু তাই পেট ফুলিয়ে রাখল। মনে মনে ভাবল, এখন থেকে বেশি বেশি ভাত খাবে সে। পেট একটু মোটা হলেই প্যান্টটা কোমরে টাইট হয়ে থাকবে। জুতা জোড়াও বেশ ঢলঢলে। মা বুদ্ধি করে জুতার ভিতরে একটু ন্যাকরা গুঁজে দিল। বেশি টাইট মনে হওয়ায় জুতার ভিতরে পায়ের আঙ্গুলগুলো বাঁকা করে রাখল নান্টু। মা জুতার ফিতে বেঁধে দিয়ে নান্টুকে দেখতে লাগল।

মা বলল, একদম রাজপুত্রের মতো দেখাচ্ছে।

আব্বা বলল, বাহ! নান্টু আমাদের সাহেব হয়ে গেল। এখন ভাল করে লেখাপড়া কর। ক্লাস ফাইভ পাস করলে তোমাকে শহরে রেখে পড়াব। তখন সবসময় এ রকম সুন্দর জামা-কাপড় পরবে।

নান্টু মনে মনে ঠিক করল, আজ সারা রাত চেঁচিয়ে পড়বে। আব্বাকে পড়া দেখাবে। কিন্তু এখন তো আর পড়ার সময় নয়। তাই মাকে বলল, এগুলো পরে বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি?

মা বলল, বুঝেছি। মানুষকে না দেখালে শান্তি হচ্ছে না। ঠিক আছে, যা সবাইকে একবার দেখিয়ে এনে খুলে রাখবি।

অভ্যাসবশে নান্টু দৌড় শুরু করেও থামল। এরকম জামা-কাপড় পরে কেউ দৌড়ায়? বাড়ি থেকে বেরিয়ে মেঠো পথ ধরে, পেট ফুলিয়ে ভদ্রলোকের মতো আস্তে ধীরে হাঁটতে লাগল সে। যেন শহর থেকে কোন সাহেব গ্রামে বেড়াতে এসেছে।

এমনিতে নান্টু আস্তে হাঁটতে পারে না। কোথাও যেতে হলে দেয় ছুট। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চলতে তার ভাল লাগে। কিন্তু জুতা-ফুলপ্যান্ট পরে সে কখনও ছোটাছুটি করেনি। দিন-রাত বারো মাসই হাফপ্যান্ট পরে নান্টু। গাঁয়ে ঘোরা-ফেরার সময় পা থাকে খালি। অনেক সময় গায়ে গেঞ্জিও থাকে না।

গরমের সময় গাঁয়ের সব লোক খালি গায়ে চলাফেরা করে। বড়জোর তাদের ঘাড়ে কিংবা মাথায় বাঁধা থাকে একটি গামছা। এ রকম একটি লোক নান্টুকে হাঁ-মেলে দেখল। তারপর খুশিতে দাঁত বের করে বলল, হায় আল্লা! আমি ভাবলাম গরমের দিনে সুটকোট পরে এটা কোন সাহেব বাবু এলো? এ যে দেখছি আমাদের নান্টু সাহেব। তা কোথায় যাচ্ছ বাবা?

নান্টু তো আর বলতে পারে না, সবাইকে নতুন জামা দেখাচ্ছে। তাই গম্ভীর হয়ে জবাব দিল, রবদের বাড়ি যাব। জরুরি দরকার আছে।

সাইকেলে চড়ে যাওয়ার সময় একটি অচেনা লোকও নান্টুকে মাথা ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। নতুন কিছু দেখতে পেলে নান্টুর যেমন ভাল লাগে, নতুন নান্টুকে দেখে সবারই তেমনি ভাল লাগছে নিশ্চয়। তাকে দেখে সবাই আশ্চর্য এবং খুশি হচ্ছে। এ কথা ভেবে গর্বে নান্টুর বুকখানা ফুলে উঠল।

রবদের বাড়িতে যাওয়ার আগেই রব তাকে দেখতে পেল। কলরব করে ছুটে এলো কাছে।

নান্টু তুই কি স্কুলের ইনস্পেক্টর হয়ে গেছিস! গরমের দিনে ঈদের জামা গায়ে দিয়ে ফোটানি দেখাচ্ছিস কেন?

নান্টু বলল, এগুলো ঈদের জামা না। বেড়াতে যাওয়ার জন্য আব্বা আজকেই এনে দিয়েছে টাউন থেকে। অনেক দাম।

রব নান্টুর নতুন জামা নেড়েচেড়ে, পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখতে লাগল। তার চোখেও পলক পড়ছে না। নান্টু পা তুলে ধরে বলল, জুতাটা দেখ, কী সুন্দর গন্ধ।

রব বন্ধুর জুতায় নাক লাগিয়ে ঘ্রাণ নিল। তারপর জোরে টেপাটেপি করতে লাগল। নান্টু রেগে বলল, ওভাবে টিপছিস কেন? ময়লা লাগবে তো।

রব বলল, আমার বাবাও পাট বেচে হাট থেকে এ রকম জুতা-প্যান্ট কিনে দেবে। আর আমি মেলায় গেলে একটা চশমা আর ঘড়িও কিনব। চশমা ঘড়ি না পরলে ভদ্রলোক হওয়া যায় না।

নান্টু ভাবল, রব আসলে কথাটা মিথ্যে বলেনি। এ রকম জামা-জুতার সঙ্গে চশমা ঘড়ি পরলে তাকে দারুণ মানাত। আব্বার ঘড়িটা অবশ্য পরা যায়। আব্বা সবসময় হাতে ঘড়ি পরে না। খুলে রাখে। আলমিরাতে খামাখা পড়ে থাকে ঘড়িটা। কিন্তু বড় মানুষের ঘড়ি তো, চেনটা অনেক বড়। নান্টু পরেছিল। হাতের কোথাও আটকায় না। পায়ে অবশ্য টাইট করে পরা যায়। নান্টু একবার চুপি চুপি পরে দেখেছে। কিন্তু পায়ে ঘড়ি পরলে লোকে পাগল বলবে না?

নান্টু তাই বলল, আমি তো এবার কান্দির মেলায় যাচ্ছি। ঘড়ি, চশমা, ঘুড্ডি সব কিনব।

রব নান্টুর নতুন জামা দেখে যেমন, তেমনি কান্দির মেলায় যাওয়ার কথা শুনে চমকে উঠল। সবাই জানে, দিল্লী বহু দূর। কান্দির মেলাও তেমনি। বড় মানুষরাও হেঁটে যেতে ভয় পায়। যে হেঁটে যায় কান্দির মেলা, সে-ই পায়ের ব্যথায় কেঁদে ফেলে। রব তাই আঁতকে উঠে বলল, কী! তুই কান্দির মেলায় যাবি! কার সাথে?

গণি ভাই আমাকে নিয়ে যাবে বলেছে।

রব ভয় দেখিয়ে বলল, গণি ভাই কেমন ছেলে জানিস না? তার সঙ্গে তোকে মেলায় যেতে দেবে? দাঁড়া আমি তোর মাকে এখনই বলে দিচ্ছি।

রব নান্টুদের বাড়ির দিকে দৌড় দিল। নান্টু ভয় পাওয়ার বদলে হাসল। কারণ মাকে তো সে আগেই বলে রেখেছে। নান্টু তাই গণি ভাইদের বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল।

গণি ভাইকে গ্রামের লোকে বলে বাউদিয়া গণি। বাউদিয়া মানে বাউন্ডেলে। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে সে কত জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। হাত ছেড়ে দিয়ে গণি ভাই সাইকেল চালাতে পারে। একবার বাড়ি থেকে পালিয়ে সে ঢাকাতেও গিয়েছিল। কত কী যে দেখেছে! বাস, ট্রেন, ইস্টিমার, ঘোড়াগাড়ি, ঠেলাগাড়ি, এমনকি ভালুক ও হাতির পিঠেও চড়েছে গণি ভাই। প্লেনে চড়েনি এখনও। কিন্তু ঢাকায় এয়ারপোর্টে গিয়ে কাছে থেকে প্লেন দেখেছে। গণি ভাইয়ের বেড়ানো এবং নতুন নতুন জিনিস দেখার গল্প শুনতে খুব ভাল লাগে নান্টুর। গণি ভাই তাকে বেশ আদর করে। এবার সাইকেলে চড়িয়ে নান্টুকে কান্দির মেলায় নিয়ে যাবে বলেছে।

বাড়ির উঠানে গণি ভাই তার সাইকেলখানা মুছছিল। নান্টুকে দেখে বাড়ির সবাই ছুটে এলো। গণি ভাইয়ের মা একটা টুল এনে দিল বসার জন্য। বলল, বড় লোকের ছেলে, গরমের দিনে এত সুন্দর জামা, জুতা পরেছ কেন? কোথায় যাবে?

নান্টু এখন কী জবাব দেয়? নতুন জামা-জুতা দেখাতে এসেছে, এমন কথা তো আর বলা যায় না। বুদ্ধি খাটিয়ে বলল, ক'দিন আগে আমার জ্বর হয়েছিল তো। ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে জামা-জুতা পরেছি।

গণি ভাই হেসে বলল, তুই তো আমাকেও ছাড়িয়ে গেলি! নতুন ফুলপ্যান্ট জুতা মানুষকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছিস। ব্যাপার কী রে নান্টু?

নান্টু লজ্জা পেয়ে বলল, গণি ভাই, আমাকে যে কান্দির মেলায় নিয়ে যাবেন বলেছিলেন।

গণি ভাই বলল, কান্দির বান্নী তো চৈত্র মাসে হবে। ঠিক আছে, তোকে এবার নিয়ে যাব।

নান্টু বলল, কান্দির মেলায় কি চশমা-ঘড়ি পাওয়া যায়?

গণি ভাই জবাব দিল, দেশের যত সুন্দর জিনিস সব কান্দির মেলায় ওঠে। চশমা-ঘড়ি দূরের কথা, খেলনা টেলিভিশন, টেলিফোন পর্যন্ত পাওয়া যায়। কিন্তু মেলায় যে যাবি, পকেটে কত টাকা আছে?

নান্টু প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলল, এখনও তো আব্বা-মা টাকা দেয়নি।

গণি ভাই হতাশ হয়ে বলল, তা হলেই হয়েছে। মেলায় যাওয়ার টাকা কি কেউ এমনিতে দেয়? আমি তো মেলায় গিয়ে টাকার খেলা খেলে আরো টাকা রোজগার করব।

টাকার খেলা কেমন, কীভাবে খেলে, নান্টু জানে না। তবু উৎসাহের সঙ্গে বলল, আমিও টাকার খেলা খেলব গণি ভাই।

টাকার খেলা খেলতে টাকা লাগে। মেলায় যত পয়সা নিয়ে যাবি, তত মজা। এখন থেকে পয়সা জমা। পকেট ভরে টাকা পয়সা নিতে পারলে তোকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।

ঠিক আছে।

নান্টু বাড়ির দিকে ছুটতে লাগল। কান্দির মেলায় যাওয়ার খুশি এখনই বুকের ভিতর উথলে উঠছে। গেলে না জানি আরও কত খুশি লাগবে। এই খুশিটা ধরে রাখার জন্য নান্টুর এখন পয়সা দরকার। অনেক পয়সা।

পয়সার নেশা ধরেছে নান্টুর। সবখানে পয়সা খোঁজে। সামনে মেলা। কান্দির মেলা দেখার স্বপ্ন মনে সারাক্ষণ খেলা করে। মাথায় শুধু চিন্তা, কোথায় কিভাবে পয়সা পাওয়া যায়।

নান্টু ভাবে, শিলাবৃষ্টির মতো আকাশ থেকে যদি অনেক পয়সা ঝরে পড়ত! গেলবার শিলাবৃষ্টির সময় অনেক শিল পড়েছিল নান্টুদের উঠানে। ঘরের টিনের চালে কী যে ঝমঝম শব্দ! উঠান সাদা হয়ে গিয়েছিল। সাদা সাদা ঠাণ্ডা শিল কুড়িয়ে গ্লাস

ভরেছিল নান্টু। শিলাবৃষ্টির মতো আল্লা একদিন পয়সা-বৃষ্টি দিলে সব পয়সা কুড়াত নান্টু। কিন্তু ঘরে-বাইরে কোথাও পয়সা খুঁজে পায় না সে।

নান্টু জানে, পয়সা মানুষ সব সময় লুকিয়ে রাখে। বাড়িতে পয়সা লুকিয়ে রাখার অনেক গোপন জায়গা আছে। তার মধ্যে ঘুরেফিরে আব্বার জামাটা আগে চোখে পড়ে নান্টুর। আব্বার পকেটে সব সময় কিছু না কিছু টাকা-পয়সা থাকে। নান্টু একবার আব্বার পকেট থেকে এক টাকা নিয়ে তিলের খাজা কিনেছিল। আব্বা খুব রাগ করেছিল। বলেছিল, যারা চুপিচুপি অন্যের পয়সা নেয়, তাদের চোর বলে। ফের নান্টু না বলে পয়সা নিলে চোর হিসাবে তার কড়া বিচার হবে। নান্টু তাই আব্বার পকেটে হাত ঢোকানোর সাহস পায় না। আবার এ-ও জানে সে, চাইলে আব্বা তাকে বেশি পয়সা দেবে না। আর বললে গণি ভাইয়ের সঙ্গে তাকে কান্দির মেলায় যেতেও দেবে না। নান্টু না বলেই যাবে। সে জন্য এখন থেকে তাকে বুদ্ধি করে পয়সা যোগাড় করতে হবে।

নান্টুর মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি এলো। বুদ্ধির জোরে লেখার কাঠ-পেন্সিলটা ভেঙে কয়েক টুকরো করল সে। স্কুলের অঙ্ক খাতায় অনেক সাদা পৃষ্ঠা ছিল। একটা একটা করে সব ছিঁড়ে ফেলল নান্টু। তারপর ভাঙা পেন্সিলের টুকরা আর লেখা খাতা নিয়ে মায়ের কাছে গেল।

মা, এই দেখ। পেন্সিল নেই, খাতা নেই। আমি কিভাবে অঙ্ক করি? পয়সা দাও, দোকান থেকে খাতা-পেন্সিল কিনে আনব এক্ষুণি।

মা বলল, তোর আব্বাকে বল গিয়ে। হাট থেকে এনে দেবে।

নান্টু বায়না ধরল, হাট থেকে নয়। আমার এক্ষুণি চাই। অনেক অঙ্ক করব।

মা বলল, ঠিক আছে। তোর আব্বার পকেট থেকে নে।

এখন আর আব্বার পকেটে হাত ঢোকাতে কোন বাধা নেই। নান্টু তন্ন তন্ন করে আব্বার জামার পকেট হাতড়াতে লাগল। পকেটে নোট বুক, কাগজ, কলম, সব আছে। কিন্তু টাকা-পয়সা একটাও নেই। নান্টু বিছানায়, বালিশের তলায়, তোষকের নিচে, খুঁজতে লাগল। কোথাও একটি পয়সা না পেয়ে খুব রাগ হলো তার। মাকে গিয়ে বলল, সবাই বলে আব্বা কত বড় লোক। কিন্তু আব্বা আসলে ফকির। পকেটে পয়সা নেই কেন?

মা হেসে বলল, আমি চুরি করব সেই ভয়ে তোর আব্বা টাকা-পয়সা ঘরে রাখে না। ব্যাংকে রাখে।

নান্টু জানে, হাটখোলায় সোনালী ব্যাংকে আব্বার অনেক টাকা জমা আছে। ব্যাংকের চেক বই আলমারিতে দেখেছে সে। নান্টুও চেক সাইন করতে পারবে। কিন্তু সে চেক সাইন করলে কি ব্যাংক তাকে টাকা দেবে? তাছাড়া ব্যাংকে সে যাবেই বা কি করে? নান্টু তাই মায়ের কাছে জিদ ধরল।

অতশত বুঝি না, আমার এক্ষুণি পয়সা চাই।

পয়সা চাইলে মা বলে, আমি কি চাকরি করি? তোর বাপের মতো ব্যবসা করি? পয়সা কোথায় পাব! কিন্তু নান্টু জানে আব্বার পকেট থেকে এবং গোলার ধান গোপনে বিক্রি করে মা অনেক পয়সা জমিয়েছে। সিন্দুক ও আলমারির চাবি তাই মায়ের আঁচলে বাঁধা থাকে।

নান্টু ভয় দেখিয়ে বলল, পয়সা না দিলে আমি আব্বাকে বলে দেব। তুমি অনেক টাকা জমিয়েছ।

কিন্তু মা কি আর আব্বাকে নান্টুর মতো ভয় পায়? হেসে জবাব দিল, যা বলে দে। আমার অনেক টাকা আছে জানলে তোর বাপ আমাকে আরও খাতির করবে।

নান্টু বুঝল, কথা দিয়ে হবে না। মাকে জব্দ করার অনেক উপায় তার জানা। পড়া বন্ধ করা, জোর করে পড়তে বসালে বই খাতা ছিঁড়ে ফেলা; খাওয়া বন্ধ করা, জোর করে খেতে বসালে ভাত ছুড়ে ফেলা; তারপর গলা ছেড়ে কান্না শুরু করা। কান্নাকে মা সবচেয়ে বেশি ভয় পায়। নান্টু তাই হুমকি দিল, মা তুমি এক্ষুণি পয়সা না দিলে আমি গলা ফাটিয়ে কাঁদব কিন্তু।

মা তাড়াতাড়ি বলল, কাঁদতে হবে না। দু'টাকা দিচ্ছি, পেন্সিল-খাতা কিনে আন গিয়ে।

আলমারি খুলে মা নান্টুর হাতে চারটা সিকি আর দু'টি আধুলি তুলে দিল। পয়সাগুলো পেয়ে নান্টু খুশিতে ভোঁ-দৌড় দিল। মা ভাবল, বুঝি দোকানে যাচ্ছে। কিন্তু দোকানে সে যাবে না। খাতা-পেন্সিলও কিনবে না। লেখাপড়ার চেয়ে মেলায় যাওয়ার জন্য পয়সা জমানো তার কাছে অনেক জরুরি।

বুদ্ধি খাটিয়ে মেলার জন্য প্রথম রোজগার করতে পারার খুশিতে নান্টু পকেটে পয়সা নিয়ে গাঁয়ে ঘুরতে লাগল। এখন সমস্যা হলো, পয়সা জমিয়ে সে রাখবে কোথায়? সব সময় তো পকেটে হাত ঢুকিয়ে পয়সা ছুঁয়ে রাখা সম্ভব নয়। আবার হাতছাড়া হলে হারিয়ে যেতে পারে। ঘরে কোথাও লুকিয়ে রাখলে কেউ না কেউ দেখে ফেলবে। অবশ্য মাটির তলায় পুঁতে রাখলে কেউ দেখবে না। কিন্তু যক্ষে নিয়ে নেয় যদি? নান্টু শুনেছে, আগেকার দিনে মানুষ টাকা-পয়সা পিতলের কলস বা লোটায় রেখে মাটির নিচে পুঁতে রাখত। সেই টাকা যক্ষ হয়ে যেত। সাপ পাহারা দেয় যক্ষের ধন। নিতে গেলে সর্বনাশ। আবার যাকে দেয়, তাকে স্বপ্ন দেখায়। যক্ষের ধনের স্বপ্ন দেখতেও ভয় লাগে নান্টুর। মাটিতে পুঁতে রাখলে তার জমানো পয়সা যদি যক্ষ হয়ে যায়, তবে আর মেলায় যাওয়া হবে না। তার চেয়ে একটা মাটির ব্যাংক কেনাই ভাল।

মাটির ব্যাংক হাটে এবং কুমারপাড়ায় কিনতে পাওয়া যায়। নান্টু তো একা হাটে যেতে পারে না। তাই সে ফয়েজ চাচার কাছে ছুটে গেল। ফয়েজ চাচা নান্টুদের গরু বাছুর চরায়, হাল বয়, আবার হাট-বাজারও করে দেয়। নান্টুকে বেশ আদর করে। কুমারপাড়া থেকে একটা মাটির ব্যাংক কিনে আনার আবদার শুনে ফয়েজ চাচা বলল, মাটির ব্যাংক তো যখন তখন ভেঙে যাবে। চোরেও নিতে পারে। তার চেয়ে আমি তোমাকে বাঁশের ব্যাংক বানিয়ে দেব একটা।

বাঁশের ব্যাংক বানানো খুব সোজা। গ্রামে প্রায় সব ঘরে বাঁশের খুঁটি থাকে। দুই গিটের মাঝখানে বাঁশের ভিতরটা চোঙ-এর মতো ফাঁকা। একটা গিটের নিচে ফুটো করলে ব্যাংক হয়ে গেল। পয়সা জমালে বাঁশ কেটে বের করতে হয়। নান্টুর পীড়াপীড়িতে ফয়েজ চাচা দা হাতে ঘরে এলো। ঠুক ঠুক করে কেটে একটা মোটা বাঁশের খুঁটিতে ফুটো বানাল। নান্টু পকেটের পয়সা একটা একটা করে ফুটোর মধ্যে ছেড়ে দিল। ঠক শব্দ করে পয়সাগুলো কিভাবে কোথায় গিয়ে পৌঁছল, দেখার উপায় নেই। তবে ব্যাংক কেটে বের না করা পর্যন্ত আর নড়াচড়া করতে পারবে না ওরা।

ঘরে ঢুকলেই নান্টু তার ব্যাংকের দিকে তাকায়। এমনিতে ঘরটা এবং ঘরের জিনিসপত্র তার কাছে পুরনো। টিনের বেড়া, বাঁশের খুঁটি এসব দেখার মতো জিনিস নাকি? কিন্তু ব্যাংকটা হওয়ার পর থেকে ঘরে যেন একটা দারুণ নতুন জিনিস এসেছে। ঘুরেফিরে চোখ বাঁশের খুঁটির ফুটোর দিকে যায়। তাকিয়ে থাকলে ভিতরে চকচকে পয়সাগুলো পর্যন্ত দেখতে পায় সে। মনে খুশি জাগে। আর কেউ দেখতে পাবে না। দেখলেও এই ব্যাংক থেকে কেউ পয়সা চুরি করতে পারবে না।

ঘরে এমন একটা দামী জিনিস হলো, অথচ আব্বা-মা কারও চোখে পড়ে না। নান্টু তাই একটা বুদ্ধি করল। সাদা কাগজে বড় করে লিখল 'নান্টুর ব্যাং'।

তারপর সাইনবোর্ডখানা আঠা দিয়ে ফুটোর নিচে লাগিয়ে দিল। এতে করে তার ব্যাংকটি হয়ে উঠল আরও দেখার মতো সুন্দর।

আব্বার চোখে পড়ল প্রথম। চমকে উঠে কাছে গিয়ে দেখল। তারপর হাসতে হাসতে নান্টুর মাকে ডেকে দেখাল। খুশি হয়ে ব্যাংকের মালিককে জিজ্ঞেস করল আব্বা, এটা তোমার কুনো ব্যাঙ না হোলা ব্যাঙ?

নান্টু জবাব দিল, এটা আমার সোনালী ব্যাংক। অনেক টাকা আমি এতে জমাব।

আব্বা বলল, কিন্তু এটা তো তোমার কুনো ব্যাঙ হয়ে গেছে। ক-না দিলে যে কোন সময় লাফ দিতে পারে।

নান্টু এতক্ষণে বুঝতে পারল, বানানা ভুল করেছে। তাড়াতাড়ি ব্যাং-এর পাশে 'ক' বসিয়ে দিল। আব্বা আরও খুশি হয়ে বলল, পয়সা জমানোর অভ্যাস ভাল।

মা সন্দেহ করে বলল, ব্যাংক যে বানিয়েছিস, পয়সা পেলি কোথায়?

নান্টু বলল, পয়সা তো এখনও পাইনি। আব্বা আমাকে প্রত্যেক দিন কয়টা করে পয়সা দেবে?

আব্বা ফকিরকে ভিক্ষা দেয়ার মতো মাত্র দু'টি দশ পয়সা বের করে দিল। নান্টু এবার মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বুদ্ধি দিল। মায়ের জমানো পয়সাগুলো নান্টুর ব্যাংকে রাখা ভাল। চোরের বাপ ডাকাতও নিতে পারবে না। আর ব্যাংক কাটলে নান্টু মায়ের সব পয়সা ফেরতে দেবে। কিন্তু মায়ের মন গলল না। বলল, ব্যাংকে রাখার মতো পয়সা আমি কোথায় পাব? তোর আব্বাকে বল, তার ব্যাংকের টাকা তুলে তোর ব্যাংকের চোঙ ভরিয়ে দেবে।

আব্বা বলল, ঠিক আছে। এবারের পরীক্ষায় ফার্স্ট হতে পারলে তোমার ব্যাংক আমি একদিনে ভরিয়ে দেব।

নান্টু এমন শর্তে খুশি হতে পারল না। পরীক্ষার অনেক দেরি। তাছাড়া ব্যাংক ভরানোর জন্য পড়াশোনা করে ফার্স্ট হওয়ার সময় আছে তার? আর মাত্র দশ দিন পরে কান্দির মেলা। নান্টু তাই দশ পয়সা দু'টি ব্যাংকে ফেলে, আরও পয়সার সন্ধানে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাইরে সারা দিন ঘুরে বেড়ালেও একটা পয়সা খুঁজে পাবে না। নান্টু জানে, পয়সা রোজগারের জন্য বুদ্ধি দরকার। আর পয়সা ধরা এবং ওড়ানোর সবচেয়ে বেশি বুদ্ধি আছে গণি ভাইয়ের। কিন্তু গণি ভাইয়ের কাছে বুদ্ধি চাইতে গেলে সে হয়ত রেগে যাবে। নান্টু এখনও অনেক পয়সা জমাতে পারেনি। শুনলে তাকে মেলাতেও নিয়ে যাবে না। গরিব ছেলেদের একদম পছন্দ করে না গণি ভাই। বলে, যার পয়সা নেই তার জীবনের কোনো দাম নেই।

নান্টুর বন্ধুরা সবাই তার চেয়েও গরিব। মানে তাদের বাবারা কেউ নান্টুর আব্বার মতো ধনী লোক নয়। গরিবের ছেলে হলেও কুদ্দুসের একটা ব্যাংক আছে। নিজের জমানো পয়সা দিয়ে সে স্কুলের বই এবং জামা পর্যন্ত কিনেছে। বুদ্ধি নেয়ার জন্যে নান্টু কুদ্দুসের কাছে ছুটে গেল।

কুদ্দুস, তোর বাঁশ ব্যাংকে কত পয়সা আছে রে?

কুদ্দুস বলল, তা কি বলা যায়! এক বছর পর ব্যাংকটা কেটে পয়সা গুণে দেখব।

তুই পয়সা পাস কোথায়?

বা রে, আমি কাজ করি না! কত মেহনত করে পয়সা জমা করি।

নান্টু জানে, স্কুল না থাকলে কুদ্দুস তার বাবার সঙ্গে ক্ষেতে কাজ করে। এইটুকু ছেলে হলে হবে কী! ধান কাটা, পাট কাটা, ভুঁই নিড়ানো, গরু চরানো সব কাজ করতে পারে সে। বাবার সাথে রোজ হাটেও যায়। কিন্তু নান্টুর আব্বা তো ক্ষেতে কাজ করে না। নান্টু এসব কাজ করলে আব্বা তাকে পয়সা দেয়া দূরে থাক, উল্টো বকা দেবে।

কুদ্দুস, আমি খুব ঠেকায় পড়ে গেছি রে। আমার অনেক পয়সা দরকার।

নান্টুর ঠেকা দেখে কুদ্দুস হেসে উঠল। বলল, তোরা কত্ত বড় লোক। মেলা ধান-পাট তোদের। তোর আবার পয়সার ঠেকা কী!

আরে গাধা, ধান-পাট কি ব্যাংকে ঢোকানো যায়?

ধান-পাট বেচলেই তো পয়সা। আমি তো মৌসুমের সময় ধান, পাট আর আমার হাঁসের ডিম বেচে পয়সা জমাই।

কিন্তু আমাকে যে একা হাটে যেতে দেয় না।

হাটে যেতে হবে না। চৌ-পথির মোড়ে হাটের দিন পাইকার বসে। তার কাছে এক গোছা পাট বেচলেও পয়সা পাবি। আমাকে দিস, ঠকাতে পারবে না। পাট ওজন করার কাঁটা চিনি আমি।

বুদ্ধিটা পছন্দ হলো নান্টুর। তাদের গোলা ভরা ধান-চাল। সারা বছর খেলেও শেষ হয় না। পাটের ধারা সাজিয়ে ঘরে পাহাড়ের মতো উঁচু ঢিপ করা হয়েছে। আব্বা মাঝে মধ্যে গরুর গাড়িতে করে ধান-পাট হাটে নিয়ে বিক্রি করে দেয়। নান্টুও যদি চুপি চুপি এক ধারা পাট পাইকারের কাছে বেচে দেয়, কেউ টের পাবে না। হাটের দিন নান্টু তক্কে তক্কে থাকল।

আব্বা হাটে যাওয়ার পর, মায়ের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ঘর থেকে এক ধারা পাট বের করল। তারপর পাটের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে ছুটতে লাগল হাটের দিকে। কুদ্দুস রাস্তায় নান্টুর অপেক্ষায় তৈরি হয়েই ছিল। দু'বন্ধু মিলে জোরসে হাটের দিকে হাঁটতে লাগল।

হাটের দিন গাঁয়ের সব লোক হাটে যায়। সবার হাতে শিশি-বোতল, ব্যাগ, অনেকের কাঁধের ভারে ঝোলানো ধান-পাট। কারও বা হাতে হাঁস-মুরগি, গরু, আবার কারও ঘাড়ে বস্তা ডালা—কত কি। কেউ বেচবে, কেউ কিনবে। নান্টুর কাঁধে পাটের বোঝা দেখে হাটুরে মানুষের দল কিছু সন্দেহ করল না। তবু নিজেকে চোর চোর মনে হতে লাগল তার। চেনা-জানা যদি কেউ দেখে ফেলে? কিছুদূর গিয়ে নান্টু তাই পাটের ধারাটি কুদ্দুসের ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। কুদ্দুস পাট নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল, আমাকেও চার আনা পয়সা দিবি কিন্তু। নান্টু মাথা নাড়ল।

চৌরাস্তার মোড়ে গলায় কালো তবিল ঝুলিয়ে একটি লোক হাটযাত্রীদের দেখছিল। তার হাতে পাটের ওজন মাপার ছোট যন্ত্র। পায়ের কাছে শোয়ানো কিছু পাট। নান্টু তাকে দেখার আগে পাইকারটি যেন তাদের চিনে ফেলেছে। দাঁত বের করে খাতির জমানো গলায় ডাকল, যাদুমণিরা এদিক আস, আমার কাছে ন্যায্য দাম পাবা। নিয়ে আস দিকিন।

কুদ্দুসের ঘাড় থেকে পাটের ধারা নিয়ে পাইকারটি উল্টে দেখল। কাঁটা দিয়ে মেপে বলল, হাটে নিয়ে গেলে পাইকাররা তোদের ঠকাবে। ছোট মানুষের ওরা গলা কাটে। কিন্তু আমি তোদের ঠকাব না।

কত টাকা দেবেন?

তুমি বল চাচা মিয়া। এইটুকু পাটের জন্য কত পয়সা চাও।

পাইকারটি নান্টুকে চাচা বলায় সে লজ্জা পেল। কুদ্দুসের দিকে তাকাল। সে তো কখনও পাট বেচেনি। কত দাম চাইবে?

কুদ্দুস বলল, এক ধারা মানে পাঁচ সের পাট। বিশ টাকা দেন।

পাইকারটি প্রথমে কপালে চাপড় দিল। তারপর বিশ টাকা না দেওয়ার জন্য কত কথা বলতে লাগল। তবিল থেকে পাইকার প্রথম আট টাকা, তারপর আরও এক টাকা, তারপর আরও এক টাকা এবং তার সঙ্গে আরও আট আনা দিল। কিন্তু কুদ্দুসকে ঠকানো সহজ নয়। সে পাটের ধারা ধরে টানতে লাগল। পনেরো টাকার কম সে মানবে না।

কেনাবেচার এত কথা নান্টুর ভাল লাগে না। বিরক্ত হয়ে সে বলল, ঠিক আছে। বারো টাকা দিন। সব সিকি আধুলি দিতে হবে কিন্তু।

পাইকারের তবিলে এত সিকি আধুলি নেই। সব খুচরো দিলে সে আর খুচরো পাট কিনবে কিভাবে? একটা ময়লা পাঁচ টাকার নোট এবং খুচরো টাকা-পয়সা মিলে বারো টাকা বুঝে নিল নান্টু।

কুদ্দুস বলল, বেটা আমাদের ঠকিয়ে দিল। আমি হলে পনেরো টাকাই আদায় করে ছাড়তাম।

নান্টু বলল, ঠিক আছে আগামী হাটে ওকে আমরা ঠকাব। নইলে হাটে গিয়ে বেচব।

এত টাকা তুই কি করবি নান্টু? চল, এক্ষুণি হাটে গিয়ে চার আনার বুট-বাদাম কিনে খাই।

না রে ভাই। আমার আরও অনেক টাকা দরকার। এক জায়গায় বেড়াতে যাব।

কোথায় যাবি?

কোথায় যাবে, নান্টু কাউকে আর বলবে না। কান্দির মেলা থেকে ফিরে এলে সবাই তো দেখবে। মেলায় কেনা নান্টুর নানারকম খেলনা জিনিসপত্র দেখে চোখ কপালে উঠবে সবার।

কান্দির মেলায় যাওয়ার আগের দিন নান্টুর ব্যাংকটা কাটতে হলো। অর্ধেকও ভরেনি। পয়সা জমাবার শখও মেটেনি নান্টুর। কিন্তু এখনই না কেটে উপায় নেই। গণি ভাই বলেছে, কাল সকাল সকাল রওয়ানা দিতে হবে। ফয়েজ চাচা বাঁশ কেটে, ব্যাংকে হাত ঢোকানোর মতো সিঁধ কেটে দিল। সবগুলো টাকা-পয়সা বের করে গুণতে লাগল নান্টু। মোট বাইশ টাকা বারো আনা। এর মধ্যে ছেঁড়া ময়লা পাঁচ টাকার নোটটা ব্যাংকের ভেতরে থেকে আরো স্যাঁতেস্যাঁতে হয়েছে। টাকাটা দেখলে পাটের পাইকারটির ওপর রাগ জাগে। মেলায় যদি এ টাকাটা কেউ নিতে না চায়?

বাড়ির কাউকে না বলে নান্টু মেলায় যাবে ভেবেছিল। কারণ শুভ যাত্রায় বাধা তার সহ্য হবে না। কিন্তু গণি ভাই গোলমাল বাধাল। লুকিয়ে পালিয়ে নান্টুকে সে অত দূরের মেলায় নিয়ে যাবে না। নান্টুর আব্বা জানলে রেগে যাবে। আর রেগে গেলে সে গণিকে মারতেও পারে। শুধু গণি নয়, নান্টুর আব্বাকে গ্রামের সব লোকে ভয় পায়। কেউ দোষ করলে আব্বা বিচার করে শাস্তি দিতে পারে। একমাত্র মা আব্বাকে তেমন ভয় করে না। মুখে মুখে তর্ক করে।

রাতে বিছানায় শুয়ে নান্টু কথাটা মাকে প্রথম বলল।

মা, আমি কিন্তু কাল গণি ভাইয়ের সাথে কান্দির মেলায় যাব। না করতে পারবে না।

কী! কান্দির মেলা কি এখানে সেখানে?

আমাকে তো এক পা-ও হাঁটতে হবে না। গণি ভাই আমাকে সাইকেলে নিয়ে যাবে।

গণির সাথে কান্দি যাবি শুনলে তোর আব্বা রাগ করবে।

তা হলে আব্বা আমাকে সাইকেলে করে ঐ মেলায় নিয়ে যায় না কেন?

তোর আব্বার খেয়েদেয়ে কাজ নেই তো। সে যাবে তোকে কান্দির মেলা দেখাতে!

তা হলে আমি গণি ভাইয়ের সঙ্গে যাবই। তোমাদের পয়সা দিতে হবে না। আমি নিজের জমানো পয়সা নিয়ে যাব। তোমার জন্যেও কিছু কিনে আনব।

মেলা থেকে আনা উপহার পাবে শুনেও খুশি হলো না। উল্টো রেগে গিয়ে বলল, কয়টা পয়সার মালিক হয়ে খুব বাড় বেড়ে গেছে তোর। এইটুকু ছেলে যাবে কান্দির মেলায়। সাহস কত্তো! দাঁড়া, তোর আব্বাকে রাতেই বলে দেব।

নান্টুরও বেশ রাগ হলো। তার এতদিনের স্বপ্নে মা আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। মেলায় যাওয়া জন্য ব্যাংক বানানো পয়সা জমানোর কোনও দাম নেই মায়ের কাছে। মেজাজ তো গরম হবেই। নান্টু চরম সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল।

মা, যদি কান্দির মেলায় যেতে না দাও, তা হলে আমি পুকুরে ডুব দেব—আর উঠব না। আর তা না হলে পেয়ারা গাছের মগডালে চড়ে নিচে লাফ দেব।

লাফ দিলে তোর পা ভাঙবে। আমার কী হবে?

মা ভয় না পাওয়ায় নান্টুর আরও রাগ হলো। ব্যথা পেয়ে নান্টু সামান্য উহ্ করলে মায়ের চোখে পানি আসে। আর পা ভেঙে মরলেও তার কিছু যায় আসে না! ঠিক আছে। নান্টু বিছানায় দড়াম করে লাথি মারল, তারপর এক লাফে বিছানা ছেড়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

বাইরে অন্ধকার। এ রকম সময়ে বাঁশঝাড়ের ভূতগুলি উঠানে এসে ঘাপটি মেরে থাকে। তা না হলে নান্টু এখনই লাফ দেয়ার জন্য বাড়ির পেছনের পেয়ারা গাছটায় গিয়ে উঠত। ঘন ঘন ডালপালা থাকায় গাছটার একদম উপরে ওঠা নান্টুর জন্য কোনও সমস্যা নয়। তবে বাইরে যেতে না পারলেও সে এখন গলা ছেড়ে কাঁদতে পারে। আব্বা এখনও ঘরে ফেরেনি। আব্বা জেনে যদি রাগ করে তবু নান্টু আজ ঘুমাবে না। সারা রাত কাঁদবে।

কাঁদার আগে দরজাটা বারবার ধাক্কা দিয়ে নান্টু শব্দ করতে লাগল।

নান্টু! এত রাতে পাগলামি শুরু করলি। তোর আব্বা ফিরলে ভীষণ রাগ করবে।

নান্টুর রাগ যে আব্বার চেয়েও বেশি, সেটা বোঝানোর জন্যে সে আরও জোরে দরজা ধাক্কা দিল। চেঁচিয়ে বলতে লাগল, করুক। কান্দির মেলায় যেতে না দিলে আমি সারারাত ঘুমাব না। জীবনেও আর পড়ব না। আমার শখের কোনও দাম নেই তোমাদের কাছে।

কী যে পাগল ছেলে আমার!

মাকে কাছে আসতে দেখে নান্টু কান্না শুরু করল। মা তার মাথায় হাত দিয়ে বলল, ঠিক আছে। তোর আব্বাকে বলার দরকার নেই। সকাল সকাল ফিরে আসতে পারলে যাস। কান্না বন্ধ রেখে নান্টু বলল, সাইকেলে যেতে কতক্ষণ লাগবে? আর গণি ভাই কি ভীষণ জোরে সাইকেলে চালায় জান তুমি?

কাল সকালে গণিকে ডেকে আনিস। আমি বলে দেব।

মা বলে না দিলে তো গণি ভাই নিয়ে যাবে না। মা রাজি হয়ে যাওয়ায় আকাশে মেঘ কেটে গিয়ে যেন চাঁদ উঠল। লক্ষ্মী ছেলের মতো বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল নান্টু। জলদি না ঘুমালে সকাল সকাল উঠতে পারবে না।

পরদিন সকালে চা-নাস্তা খেয়ে আব্বা বাড়ির বাইরে যেতেই নান্টু ছুটে গেল গণি ভাইয়ের কাছে। গণি ভাই তৈরি হয়েছিল। যেখানে খুশি সে যাক, বাড়ির কেউ কিছু বলে না। স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করার জন্য বাড়ি থেকে তাকে সাইকেল কিনে দিয়েছে। নান্টুকে সাইকেলে চড়িয়ে গণি ভাই নান্টুদের বাড়িতে এলো। মাকে বলল, নান্টু তো কান্দির মেলা যাওয়ার জন্য আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছে চাচী। এখন যদি ওকে যেতে না দেন, তা হলে ওর মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

সে জন্যেই তো যেতে দিচ্ছি। সাবধানে নিয়ে যাবে। অত দূরের পথ।

আপনি কোনোও চিন্তা করবেন না চাচী। কান্দিতে আমার খালুর বাড়ি আছে। সেখানে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে নান্টুকে গোটা মেলা ঘুরিয়ে দেখাব। দরকার হয় রাতে খালুর বাড়িতে থেকে কালকে আসব।

মা ভয় পেয়ে বলল, না, না। নান্টুকে ছেড়ে রাতে আমি থাকতে পারব না। তাছাড়া ওর আব্বা রাগ করবে। সন্ধ্যার মধ্যে চলে আসবে।

নান্টু ততক্ষণে নতুন জামা-প্যান্ট ও জুতা পরে নিয়েছে। ব্যাংকের টাকা-পয়সাগুলি এখন নান্টুর পকেটে। বাইরে থেকে দেখেও বোঝা যায়, নান্টুর পকেট খালি নয়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে মুখে একটু স্নো-পাউডার মাখল। চুল আঁচড়াল। ঈদের দিন সবাই সাজুগুজু করে। ঈদের চেয়েও নান্টুর আজ বেশি খুশির দিন। সাজবে না সে?

মা দেখে বলল, এই গরমে ফুলপ্যান্ট জুতা-মুজা পরলি কেন?

নান্টু বলল, গণি ভাই পরেছে। আমি পরব না! অতবড় মেলায় ফকিরের মতো কেউ যায় নাকি?

তা তো ঠিকই। ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে, সওদাগরের বেটা বাণিজ্য করতে যাচ্ছে। তা আমার জন্য কি নিয়ে আসবি নান্টু?

তুমি বলো মা, কি আনব তোমার জন্য? তোমাকে পয়সা দিতে হবে না।

ঠিক আছে, তোর পয়সা দিয়ে আমার জন্য কদমা আর বাতাসা কিনে আনবি। আর আমি আরও পাঁচ টাকা দিচ্ছি, যা মন চায় করিস। এরপরে যেন আর কোনো মেলায় যাওয়ার বায়না না শুনি। ঠিক আছে?

নান্টু মাথা নাড়ল। মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, তুমি কোনও চিন্তা করো না মা। তোমার জন্য কদমা বাতাসা নিয়ে সন্ধ্যার মধ্যে আমরা ফিরে আসব।

মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে নান্টু সাইকেলের রডে দু'পা ঝুলিয়ে বসল। গণি ভাই বিসমিল্লাহ বলে সাইকেল ছেড়ে দিল। পেছন থেকে মা চেঁচিয়ে কি যেন বলল। নান্টু শুনতে পেল না। পেছনে ফিরে তাকাবারও উপায় নেই আর। কারণ গণি ভাই জোরসে সাইকেল চালাতে শুরু করেছে।

বাই-সাইকেলে চড়া অবশ্য নান্টুর জন্যে নতুন কিছু নয়। কারণ সে নিজেই সাইকেল চালাতে পারে। গাঁয়ের যেসব জোয়ান লোক মাঠে কাজ করে, হাল বয়, তারা অনেকেই সাইকেল চালাতে পারে না। এইটুকু ছেলে নান্টুর সাইকেল চালানো তারা অবাক হয়ে দেখে। বড়দের সাইকেল অবশ্য বড়দের মতো সিটে বসে চালাতে পারে না নান্টু। কিন্তু ডান হাত সিটে রেখে, বাম হাতে হ্যান্ডেল ধরে, নিচে ঝুলে বড়দের মতোই সোঁ সোঁ করে চালাতে পারে সে। সুযোগ পেলেই আব্বার সাইকেলখানা আঙিনায় চালায় নান্টু। রাস্তাতেও বের করে। কিন্তু গ্রামের চৌহদ্দি পেরিয়ে নান্টু সাইকেল চালাবার সাহস পায় না কখনো। আর গণি ভাইকে দেখ, তার কোনো ভয়ডর নেই। সাইকেল নিয়ে সে গোটা দুনিয়া ঘুরতে পারবে। সাইকেলের চাকা ঘোরার মতো একটু চিকন রাস্তা হলেই হলো। একটুও ঢুলাঢুলি না করে, গণি ভাই তীরের মতো সাঁ সাঁ করে চালাচ্ছে।

নান্টু জীবনেও এতদূর আসেনি। কিন্তু গাছের ওপর থেকে দূরের পৃথিবীকে দেখেছে।

উপর থেকে দেখলে মনে হয়, আকাশটা নিচু হয়ে নেমে পড়েছে একটা সবুজ রেখার ওপর, মনে হয় ঐ সবুজ রেখাটাই বুঝি পৃথিবীর সীমানা। উপর থেকে দেখা সেই সীমানা পেরিয়ে গণি ভাইয়ের সাইকেল এখন অচেনা গ্রামের ভেতর দিয়ে ছুটে চলেছে। নতুন কিছু দেখার তৃষ্ণায় নান্টুর চোখ ঘুরছে। ডানে, বামে, সামনে, কখনও বা উপরেও। কিন্তু অচেনা এসব গাঁয়ের সবকিছু নান্টুদের গ্রামের মতো। আঁকাবাঁকা মেঠো পথ, পথের দু'ধারে সবুজ ধানক্ষেত, পাটক্ষেত, খাল, বিল, বাঁশঝাড়, গাছপালা

ঘেরা বাড়িঘর, মানুষজন, গরু-ছাগল, এমনকি গাছের পাখিগুলিও একইরকম। এসব দেখে নান্টুর মন ভরে না। এগুলি ভাল লাগলে তো নান্টু প্রতিদিন একটি করে নতুন গ্রাম দেখতে চাইত। কান্দির মেলায় যাওয়ার জন্য এত জেদাজেদি করত না।

নান্টু সামনের দিকে তাকিয়ে মেলার কথা ভাবতে লাগল। আর কতদূর? কথাটা গণি ভাইকে জিজ্ঞেস করতেও সাহস হয় না। গণি ভাই তো বলেছে কম করে বিশ মাইল পথ। তিন/চার ঘণ্টা সময় লাগবে। হাতে একটা ঘড়ি থাকলে নান্টু সব সময় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারত, আর কতক্ষণ পর তারা মেলায় পৌঁছবে? মেলায় পৌঁছে নান্টু আগে ঘড়ি আর চশমাটা কিনবে। তারপর মাকড়সা-কন্যা, পুতুলের যুদ্ধ, কুয়ার মধ্যে মটর সাইকেল চালানো খেলাগুলি আগে দেখে নেবে। একটা জাহাজ ঘুড্ডিও কেনার ইচ্ছে নান্টুর। কিন্তু ঘুড্ডিটা কি সাইকেলে করে বাড়িতে আনা যাবে?

কিরে নান্টু, সাপের মতো নড়চড় করছিস কেন?

গণি ভাইয়ের কথা শুনে নান্টু স্থির হয়ে থাকল। তার আসলে শরীর ব্যথা হয়ে গেছে। এতক্ষণ রডের ওপর বসে থাকা যায়? পায়ে ঝিঁঝি ধরেছে। বারবার নড়েচড়ে না বসলে, মনে হয় পাখনা ঝিঁঝি একদম খেয়ে নেবে। নান্টু নিজের কষ্ট গোপন করে বলল, খুব গরম পড়েছে গণি ভাই।

সাইকেল চালাবার খাটুনিতে গণি ভাই ফোঁস ফোঁস করে হাঁপাচ্ছিল। নান্টুর মাথার ওপর গরম নিঃশ্বাস ফেলে বলল, কথায় আছে না কান্দির মেলা গেলে কাঁদতে হয়। আমার তো চোখ দিয়ে পানি পড়ে না। কিন্তু ঘামে শরীরের সব পানি বের হয়ে যাচ্ছে। সামনে একটা বাজার, ঐ খানে নেমে পানি খাব।

সামনের বাজারে যখন তারা নামল, নান্টুর ডান পাটা তখন ঝিঁঝি অবশ করে দিয়েছে। এক পা ফেলে নান্টু হাঁটতে পারে না। গণি ভাই বলল, দৌড়া। তা হলে ঝিঁঝি পালাবে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কিছুক্ষণ হাঁটার পর, পাটা ভাল হলো নান্টুর। বাজারে পানি খেয়ে, কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার সাইকেল উঠল তারা।

রাস্তায় নান্টু দেখল, তার চেয়েও বড় কয়েকটি ছেলে দল বেঁধে হেঁটে যাচ্ছে। গণি ভাই বলল, এরাও কান্দির মেলায় যাবে। নান্টু খুশিতে চেঁচিয়ে বলল, আমরা কি মেলায় এসে গেছি? আর কত দূর?

গণি ভাই বলল, এখনও অনেক পথ বাকি। মানুষ কতদূর থেকে হেঁটে হেঁটে কান্দির মেলায় যাচ্ছে। তুই তো আরামে আমার সাইকেলে চড়ে যাচ্ছিস। মেলায় গিয়ে আমাকে কি খাওয়াবি রে নান্টু?

আপনি কি খেতে চান, বলেন।

গণি ভাইয়ের কথা নান্টু এবার শুনতে পেল না। কারণ রাস্তাটা বেঁকে যাওয়ায় পশ্চিমা বাতাসের মুখোমুখি হয়েছে তারা। বাতাস ঠেলে সাইকেল আর সামনে এগোতে চায় না। বাতাস লেগে নান্টুর কান সোঁ সোঁ করছে, চুল উড়ছে, জামা উড়ছে, আর গণি ভাইয়ের হাঁপানোর আওয়াজ এবং কথাগুলি পেছনে উড়ে যাচ্ছে। সাইকেল চালাতে খুব কষ্ট হচ্ছে গণি ভাইয়ের।

রাস্তাটা আবার বেঁকে যেতেই বাতাস এবার পিঠে ধাক্কা দিতে লাগল। সাইকেল জোরে ছুটতে লাগল আবার।

নতুন করে নান্টুর দু'পায়ে যখন ঝিঁঝি ধরেছে, গণি ভাই তখন একটা অচেনা বাড়ির সামনে এসে নামল। বলল, এটা আমার খালুর বাড়ি। এখানে সাইকেল রেখে হেঁটে মেলায় যাব। গণি ভাইয়ের খালা নান্টুর পরিচয় পেয়ে খুশি হলো। বলল, বড় লোকের বেটাকে নিয়ে এসছিস। মুরগি জবাই করি, ভাত রাঁধি, খেলেদেয়ে মেলা দেখতে যাবি।

গণি ভাই বলল, আমাদের সময় কম খালা। আপনি রান্না করেন, আমরা ততক্ষণ মেলা দেখে আসি। খেয়েদেয়ে বিকালের মধ্যে বাড়ি রওনা দেব। রাতের মধ্যে না ফিরলে নান্টুর আব্বা আমাকে আস্ত রাখবে না।

নান্টুর পায়ের ঝিঁঝি ধরা কেটে গেছে। গণি ভাইয়ের পিছু পিছু আঁকাবাঁকা পথ ধরে জোরে হাঁটতে লাগল সে। আর মাত্র আধা ঘণ্টা হাঁটলে তারা মেলায় পৌঁছে যাবে। ধুলো ভর্তি বড় রাস্তায় উঠে দেখল, দল বেঁধে নানা বয়সের ছেলেমেয়ে এবং মহিলারাও হেঁটে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে এরা, জিজ্ঞেস না করেই বোঝা যায়।

নান্টু তবু জিজ্ঞেস করল, গণি ভাই, এ দেশে মেয়েরাও মেলায় যায়?

গণি সাদা শাড়ি পরা মহিলাদের দিকে তাকিয়ে হেসে জবাব দিল, ওরা হিন্দু! মেলার পাশে নদীতে ডুব দিয়ে ওরা স্নান করবে। আরও কত মজার জিনিস দেখতে পাবি। ঐ দেখ, মেলা দেখা যাচ্ছে।

নান্টু দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে দেখল, অনেক লোকের ভিড়। আকাশে অসংখ্যা ঘুড়ি উড়ছে, বেলুন উড়ছে। মেলা থেকে নানারকমের শব্দ ছুটে আসছে। নাকে এসে লাগছে মেলার গন্ধ। নান্টুর বুক ধকধক করতে লাগল।

মেলার ভেতরে ঢুকে গণি ভাই বলল, আমাকে খাওয়াবি বলছিলি। চল, আগে কিছু খেয়ে নি।

কত রকম যে খাওয়ার দোকান বসেছে মেলায়। দেখলে খিদে বেড়ে যায়। মুড়ি মুড়কি, বাতাসা, কদমা, গজা, তিলের খাজা, বাদাম, বুট, বিস্কুট আরো যে কতো কি! নানা রকম ফলমূল ও মিষ্টির দোকানও অনেক। গণি ভাই নান্টুকে নিয়ে একটা মিষ্টির দোকানে বসল। গরম জিলাপি ভাজা হচ্ছে। রস চুইয়ে পড়ছে জিলিপি থেকে। দেখলে জিভে পানি আসে। নান্টু বলল, গণি ভাই আপনাকে এক টাকার জিলিপি খাওয়াব।

তুই তো আচ্ছা কৃপণ রে। কত কষ্ট করে তোকে মেলায় আনলাম। মাত্র এক টাকার জিলিপি খাওয়াবি।

নান্টু লজ্জা পেয়ে বলল, ঠিক আছে। তাহলে দু টাকার জিলিপি খান। আমার অনেক কেনাকাটা আছে তো।

জিলিপি খেয়ে গণি ভাই একটা সিগারেট ধরাল।

গ্রামেও গণি ভাই বড়দের সামনে বিড়ি সিগারেট খায়। নান্টুর আব্বাকে অবশ্য ভয় পায়। একদিন আব্বাকে দেখে গণি ভাই সিগারেট ফেলে সব ধোঁয়া গিলে ফেলে কাশতে শুরু করেছিল। বাড়িতে পাটকাঠিকে সিগারেট বানিয়ে নান্টু গণি ভাইয়ের মতো মিছেমিছি সিগারেট টেনেছে কয়েকবার। এখন গণি ভাইয়ের আরামে সিগারেট টানা দেখে নান্টুরও ইচ্ছা হলো সত্যি সিগারেট টেনে দেখে। আব্বা মা কেউ দেখবে না। জানবেও না। কিন্তু মেলার অচেনা লোকজন নান্টুকে তাকিয়ে দেখছে। সুন্দর জামা-জুতা দেখে তাকে ভালো ছেলে ভাবছে নিশ্চয়। সিগারেট খেতে দেখলে সবাই তাকে খারাপ ভাববে না? কথাটা গণি ভাইকে বলারও সাহস হলো না। মেলার দিকে তাকিয়ে বলল, গণি ভাই মাকড়সা-কন্যা পুতুল নাচ কোথায়?

আছে, আছে। সব দেখবি। কত টাকা এনেছিস দেখি। এক কাজ কর, টাকা-পয়সা আমার কাছে দে। নইলে হারিয়ে ফেলবি।

নান্টু দ্বিধায় পড়ল। জমানো টাকা কেউ কাউকে দেখায়? মা কখনও দেখিয়েছে নান্টুকে? তার এত কষ্টের জমানো টাকা গণি ভাই নিয়ে আরে। জিলিপি খেয়ে ফেলে যদি? পকেট চেপে ধরে সে বলল, আমার পকেটে পকেটমারও হাত ঢোকাতে পারবে না।

ঠিক আছে, তুই আমাকে আগে বিশ টাকা ধার দে। আমি টাকার খেলা খেলে জিতলে তোকে ধার শোধ করে লাভও দেব।

যদি হেরে যান? আমি ঘড়ি চশমা টমটম গাড়ি আরো কতো কি কিনব যে।

চিন্তা করিস না। হেরে গেলে খালার কাছে থেকে টাকা নিয়ে আসব। তোকে মেলা দেখিয়ে, সব কিছু কিনে দিয়ে তারপর বাড়ি ফিরব।

নান্টু কি আর করে! পকেট থেকে টাকা-পয়সা বের করে গুণতে লাগল। ময়লা ছেঁড়া নোটগুলি সহ বিশ টাকা দিল গণি ভাইকে। টাকা হাতে নিয়ে গণি বলল, তুই এই মিষ্টির দোকানে একটু বসে থাক। ওখানে বেশ ভিড়। আমি এক দান খেলেই চলে আসব।

গণি ভাই তাকে একলা ফেলে রেখে যাওয়ায় নান্টুর মন খারাপ হতে লাগল। তার টাকা নেয়া যায়, আর তাকে সঙ্গে নেয়া যায় না? নান্টু কি ভিড়ে দাঁড়িয়ে গ্রামে হাডুডু ফুটবল খেলা দেখেনি? গণি ভাই তাকে খেলায় না নিক, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টাকার খেলাটা দেখলেও তো মজা লাগত নান্টুর। এখন চুপচাপ, একা একা কতক্ষণ বসে থাকে সে? নান্টু ছটফট করতে লাগল।

মেলায় শত শত ছেলে-মেয়ে মজা করে ঘুরছে। কতো কি কিনছে। ছেলে-মেয়েদের মতো মাছিরাও দোকানের মিষ্টি আর আটা তরমুজের ওপর ভনভন করে ঘুরছে। ওরাও যেন মনের খুশিতে মেলা দেখছে। আর নান্টু মেলায় এসেও মেলা দেখতে পারছে না। মন খারাপ করে চুপচাপ আর বসে থাকতেও একদম ভাল লাগছে না তার। নান্টু মিষ্টির দোকানের বেঞ্চি থেকে উঠে দাঁড়াল। গণি ভাই ফিরে এলে এই

দোকানে অপেক্ষা করবে নিশ্চয়। নান্টু ততক্ষণ একা একা মেলাটা ঘুরে দেখবে। টাকা খেলার মাঠে গণি ভাইয়ের দেখা পেলে চিৎকার করে বলবে, গণি ভাই আমি এখানে।

মাঠে সাজানো খাবারের দোকানগুলি পেরিয়ে নান্টু হাঁটতে লাগল। মেলার ভেতর থেকে মেলার শুরু এবং শেষ চোখে পড়ে না। দুদিকে শুধু দোকান। চট, বাঁশ, কিংবা কাপড়ের বেড়া দিয়ে ঘেরা। কোনো কোনো দোকান একেবারে উদম। যে জমিতে ধান পাট হয়, মেলার দিনে সেখানে নানারকম দোকান বসেছে। আর দোকানগুলির সামনে ভিড় করে আছে ছোট, বড় ছেলেমেয়ে। বুড়ো ধাড়ি লোকেরাও এসেছে। মনে হয় আশাপাশের গ্রামের কেউ আর ঘরে নেই। নান্টুদের গ্রাম থেকে এসেছে শুধু নান্টু আর গণি ভাই। মেলা দেখতে দেখতে, ভিড়ের মধ্যে তাকিয়ে নান্টু গণি ভাইকেও খুঁজতে লাগল।

টমটম গাড়ির টুংটাং শব্দ, পাখির ডাক আর বাঁশির সুর শুনে নান্টু যেদিকে এগিয়ে গেল, সেদিকে অনেক খেলনার দোকান। এক দোকানে কাগজের কুমির, প্লাস্টিকের ইঁদুর। সুতা টেনে ধরলে কামড়াবার জন্য সত্যিকার ইঁদুর এবং কুমিরের মতো দৌড় দেয়। আরেক দোকানে সোলার পাখি। ঘোরালে কিচির মিচির ডাকে। তাল পাতার সেপাই।

মাটির চাকার তৈরি ছোট টমটম গাড়ি। চালালে টুংটাং শব্দ হয়। তারপর মাটির তৈরি বাঘ, হরিণ, হাতি, ঘোড়া। আরো যে কতরকম খেলনা! সবাই তো সব কিনতে পারবে না। তবু দেখার জন্য ছোট ছেলেদের ভিড় এখানেই বেশি। নান্টু কোনটা ছেড়ে কোনটা কিনবে? মনে মনে ঠিক করার জন্য খেলনাগুলি ভাল করে দেখতে লাগল সে। কুমির আর সোলার পাখির দামও জিজ্ঞাস করল। কাগজের কুমিরটা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে, সুতা টেনে ছেড়ে দিলে রব, কুদ্দুসরা, এমনকি মাও ভয়ে পালাবে। এ কথা ভেবে নান্টুর মুখে হাসি ফুটল।

খেলনার রাজ্য পার হতেই ফাঁকা মাঠে চোখে পড়ল ঘুড়ির দোকান। ঘুড়িওয়ালারা আকাশে উড়িয়ে দিয়েছে কত ঘুড়ি। মুখ আসমানের দিকে মেলে দেখতে দেখতে ঘাড় ব্যথা হয়ে যাচ্ছে ছেলেদের। তবু তাদের দেখার হাউস মিটছে না। নান্টু ঘুড়ি কিনবে না। কারণ সাইকেলে আসার সময় বাতাসে তার চুল প্রায় ছিঁড়ে যাচ্ছিল। ঘুড্ডি তো ছিঁড়বেই। তবু গ্রামে ফিরে বন্ধুদের কাছে ঘুড্ডির গল্প করার জন্য নান্টু কপালে হাতের ছাউনি দিয়ে খেলতে লাগল। জাহাজ ঘুড্ডি, ঢোল ঘুড্ডি, মানুষ ঘুড্ডি, সাপ ঘুড্ডি, পাখি ঘুড্ডি, এরকম যে আরো কত্তো। ঘুড্ডির দোকানে নানারকম লাটাইও আছে। নান্টুদের গ্রামের কোনো ছেলে এতরকম ঘুড্ডি দেখেনি।

ঘুড়ির দোকান পেরিয়ে ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে নান্টু এক সঙ্গে অনেকটা মেলা দেখতে পেল। মেলাটা বসেছে নদীর ধারে। নদীতে স্নান করছে অনেক হিন্দু মহিলা। উলু ধ্বনি দিচ্ছে তারা। নান্টু জানে, মেলার সময় এ নদীতে স্নান করলে তাদের পুণ্য হয়।

নদীর পাড়ের ভিড় ঠেলে আবার মেলার ভেতরে ঢুকল। মাইকের আওয়াজ কানে এল তার। আসুন আসুন, মাকড়সা-কন্যাকে এক নজর দেখে যান। অর্ধেক মাকড়সা, হাত-পা আটখানা, কিন্তু মুখখানা তার রাজকন্যার মতো সুন্দর। টিকেট মাত্র আট

আনা। আসুন...। মাইকের ডাক শুনে নান্টুর বুক আবার খুশিতে ধক ধক করল। গতবার মেলায় এসে গণি ভাই মাকড়সা-কন্যাকে স্বচক্ষে দেখে গেছে। নান্টুদের কাছে অনেক গল্প করেছে। গণি ভাই আসলে মিথ্যে বলেনি। নান্টুও আজ স্বচক্ষে দেখে যাবে। কিন্তু এখনও যে গণি ভাইকে সে খুঁজে পেল না। হায়! নান্টু তো এখনও টাকা খেলার মাঠে খোঁজেনি। কোথায় যে টাকার খেলা হয়, নান্টু তাও জানে না।

একটি বড় লোককে নান্টু জিজ্ঞেস করল, এই যে ভাই, টাকার খেলা কোন দিকে?

লোকটা নান্টুর দিকে অবাক হয়ে তাকাল। তারপর হেসে বলল, এইটুকু ছেলেও জুয়া খেলবে! একে বলে কলিকাল। যান যান বাপের পয়সার ছেরাদ্ধ করেন গিয়ে। ঐ তো সামনে লটারীর কত দোকান।

নান্টু ভাবল, লোকটাকে বলে দেয়, সে নয়, গণি ভাই জুয়া খেলে। কিন্তু বলে কী লাভ? লোকটা কি আর গণি ভাইকে চেনে? নান্টু সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

এক জায়গায় গোল ভিড় ঠেলে নান্টু দেখল, মাটির ওপর সাজানো নানারকম জিনিস। স্নো, পাউডার, সাবান, তেলের শিশি, টাকার নোট এবং পয়সা। একটা লোক রিং ছুড়ে দিচ্ছে। রিংটা যে জিনিসে পেঁচিয়ে ধরবে, সেই জিনিসটা তার হবে। এক টাকা দিয়ে দুইটা রিং কিনে একটা লোক দশ টাকার নোট লক্ষ্য করে ছুড়ল। কিন্তু একটা জিনিসও ধরতে পারল না। এর নাম কি টাকার খেলা? নান্টুর ভাল লাগল না। অন্য আর একটা ভিড়ের মধ্যে মাথা গলিয়ে দিল সে।

সাদা কাগজের অসংখ্য টুকরো টাঙিয়ে রেখেছে দোকানটায়। কাগজে কিছু লেখা নেই। কিন্তু কাগজের টুকরোটা পানিতে ভেজালে একটা নাম্বার ফুটে ওঠে। নাম্বার অনুযায়ী দোকানের জিনিস পাবে লোকেরা। নান্টু এই লটারি খেলার বুদ্ধি জানে। লেবুর রস দিয়ে কাগজে লিখলে কাগজ সাদা থাকে। পানিতে ভেজালে লেখা ভেসে ওঠে। লটারীওয়ালার বুদ্ধিটা নান্টু জানে বলে তাকে ঠকাতে পারবে না। পকেট থেকে একটা সিকি বার করে নান্টু তাই এক টুকরা কাগজ কিনল। পানিতে ভিজিয়ে দেখল ২২ নম্বর উঠেছে। ২২ নম্বরে কি লেখা আছে? দুটি সুচ। সুচ দুটি পেয়ে খুশি হলো নান্টু। কারণ রিং ছুড়লে তো কিছুই পেত না। চার আনা পয়সা দিয়ে দুটি সুই তো জিতে নিল সে।

কাগজের লটারি খেলা থেকে বেরিয়ে নান্টু আবার গণি ভাইকে খুঁজতে লাগল। এক জায়গায় ভিড়ের মধ্যে হৈচৈ। মারামারি বেধেছে। দুটি পুলিশকেও দেখল নান্টু। ছোট ছেলে-মেয়েরা ভয়ে পালাচ্ছে। নান্টু উল্টো দিকে ছুটতে লাগল। তার ভীষণ ভয় করছে এখন। এতক্ষণ হয়ে গেল, গণি ভাইকে এখনও সে খুঁজে পেল না। গণি ভাই কি তার জন্য ঐ মিষ্টির দোকানে গিয়ে অপেক্ষা করছে?

খুঁজতে খুঁজতে নান্টু আবার খাবারের দোকানগুলির কাছে এল। যে দোকানে বসে জিলিপি খেয়েছে, সেই দোকানে বসে আছে অন্য লোক। জিলিপি মিষ্টি খাচ্ছে সবাই। নান্টুর দিকে কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না। নান্টু কোথাও গণি ভাইকে দেখতে পাচ্ছে না। টাকার খেলা খেলতে মানুষের এত সময় লাগে? নাকি গণি ভাই নান্টুর টাকাগুলি

হারিয়ে ফেলেছে? নাকি একা চুপি চুপি গজা মিষ্টি আর সিগারেট খেয়ে শেষ করে দিয়েছে? ভয়ে এখন নান্টুর কাছে আসতে সাহস পাচ্ছে না? বাড়িতে ফিরে গণি ভাইয়ের বিরুদ্ধে নান্টু আব্বার কাছে বিচার দেবে। কিন্তু গণি ভাইয়ের দেখা না পেলে নান্টু একা বাড়িতে যাবে কিভাবে? রাগে-দুঃখে এবং ভয়ে বুক ফেটে কান্না আসতে লাগল তার। কান্নাটা কোনো রকমে চেপে ধরে গণি ভাইকে খুঁজতে লাগল সে।

হঠাৎ মনে পড়ল, টাকা আনার জন্যে গণি ভাই তার খালার বাড়িতে যেতে চেয়েছে। তার সাইকেলটা সেখানে আছে। গণি ভাইয়ের খালার বাড়ি মেলা থেকে বেশি দূরে নয়। হেঁটেই তো এসেছে নান্টুরা। আসার সময় তার পা ব্যথা করেনি। নান্টু একাই হেঁটে যেতে পারবে সেখানে। তারপর গণি ভাইয়ের দেখা সেখানে পাবেই পাবে। গণি ভাইয়ের দেখা না পেলেও তার খালা নান্টুকে চেনে। ওরাই নান্টুকে বাড়ি পৌঁছে দেবে। তারপর ফোরটুয়েন্টি গণিকে উচিত শিক্ষা দেবে নান্টু।

বুদ্ধিটা মাথায় আসায় নান্টুর কান্না গলা থেকে নেমে গেল। পকেটে হাত দিয়ে দেখল, এখনও কয়েক টাকা তার পকেটে আছে। নান্টু একা একাই কাগজের কুমিরটা কিনতে পারবে। তারপর মায়ের জন্য বাতাসা আর কদমা। গণি ভাইয়ের ওপর ভরসা করবে না। তার সঙ্গে মেলাতেও আসবে না আর। নান্টুর মতো ছোট ছেলেকে একলা রেখে যে জুয়া খেলতে যায়, একা একা মেলায় ঘোরে, সে কি মানুষ? বাড়িতে গিয়েই নান্টু মাকে সব বলে দেবে।

প্রথমে এক টাকা দিয়ে কুমিরটা কিনল নান্টু। তারপর এক টাকা দিয়ে একটি মাটির নকশি হাঁড়ি কিনল। হাঁড়িটার গায়ে নকশা ছাড়াও একটি হাতল আছে। হাতলঅলা হাঁড়িটা মেলায় অনেকের হাতে দেখেছে নান্টু। মেলায় জিনিসপত্র কিনে সবাই হাঁড়িতে রাখছে। এরকম সুন্দর হাঁড়ি নান্টুদের বাড়িতে একটাও নেই। মা দেখলে ভীষণ খুশি হবে। পকেটের বাকি পয়সাগুলি দিয়ে নান্টু মায়ের জন্য কদমা আর বাতাসা কিনল। হাঁড়িতে রাখল সব। লটারিতে জিতে নেওয়া সুই দুটি এবং কাগজের কুমিরটা ভাঁজ করে হাঁড়ির ভিতরে, কদমা বাতাসার ওপর রাখল। তারপর একটা কদমা মুখে দিয়ে নান্টু গণি ভাইয়ের খালার বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে। বেশ খিদেও পেয়েছে নান্টুর। রাস্তা দিয়ে দল বেঁধে ছোট বড় সবাই মেলা থেকে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। সবার হাতে মেলার কেনা জিনিস। কোলে চড়ে থাকা একটি ছেলের হাতে বেলুন। হঠাৎ বেলুনটা ফটাস করে ফেটে যাওয়ায় ছেলেটি কাঁদতে লাগল। নান্টু তার হাতের হাঁড়িটা শক্ত করে চেপে ধরল। দল বেঁধে এখনও মেলায় আসছে মানুষ। নান্টু এত বড় মেলা থেকে একা একাই ফিরছে কেন? কোথায় যাবে সে? কেউ জিজ্ঞেস করছে না। তবে অনেকেই তাকে সন্দেহের চোখে দেখছে। আর হাঁড়িটার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে, যেন কেড়ে নেবে। নান্টুর সঙ্গে কেউ নেই জানলে তো হাঁড়িটা কেড়ে নিতেই পারে। নান্টু তাই কারো দিকে না তাকিয়ে, একা একা জোরে হাঁটতে লাগল।

গণি ভাইয়ের খালার বাড়ি কি এই রাস্তায়? আর কত দূর? ভয়ে নান্টুর গা শিউরে উঠল। সে তো মেলায় যাওয়ার আঁকাবাঁকা রাস্তাগুলি ভাল করে চিনে রাখেনি। শুধু গণি

ভাইয়ের খালার বাড়িটা মনে আছে। সামনে একটা আম গাছ। তারপর একটা টিনের ঘর। উঠানে একটা কুয়া আছে। কুয়া থেকে পানি তুলে কাঁসার গেলাসে খেতে দিয়েছিল তার খালা। খালার মুখটাও মনে আছে। কিন্তু বাড়িতে যাওয়ার রাস্তাটা যে মনে করতে পারছে না নান্টু। কিভাবে যাবে সেখানে? সেখানে যেতে না পারলে গণি ভাইয়ের দেখা সে কোথা পাবে? গণি ভাই বা তার খালার দেখা না পেলে নান্টু বাড়িতে ফিরতে পারবে না।

মেলাতেও ভীষণ কান্না পেয়েছিল নান্টুর। গণির খালার কথা ভেবে কান্নাটা গিলে হজম করেছিল। এখন সেই কান্নাটা বুক তোলপাড় করে জেগে উঠছে। গলা ফাটিয়ে এক্ষুণি বেরিয়ে যাবে। নান্টু আর কান্না চেপে রাখতে পারছে না। রাস্তার ধারে একটা গাছ তলায় দাঁড়িয়ে সে চারদিকে তাকাতে লাগল। এ জায়গা সে কখনও দেখেনি। কিন্তু এই নতুন জায়গা দেখতে তার একটুও ভাল লাগছে না। মায়ের কথা মনে পড়ছে। নান্টুর চোখ উছলে পানি এল।

বাঁশের একটা বাঁক ঘাড়ে নিয়ে একটা ছেলে মেলা থেকে ফিরছিল। তার গায়ে শুধু একটা গেঞ্জি, পরনে লুঙ্গি। ছেলেটার বয়স গণি ভাইয়ের মতো হবে। রাস্তা-হাঁটা মেলা-দেখা লোকদের মধ্যে সেই প্রথম নান্টুর সামনে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, কি গো চ্যাংড়া, কাঁদো ক্যান। কী হয়েছে?

নান্টু এতক্ষণ নীরবে কাঁদছিল। এবারে ভ্যা করে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমার গণি ভাই হারিয়ে গেছে।

তোমার ছোট ভাই না বড় ভাই?

গণি আমার ভাই না। আমাদের গ্রামের ফোরটুয়েন্টি গণি।

সে কিভাবে কোথায় হারাল?

নান্টু এবার ছেলেটাকে সব বলে দিল। গণি ভাই যে তার কাছ থেকে বিশ টাকা নিয়ে জুয়া খেলতে গেছে, তাও বলে দিল।

সব শুনে ছেলেটি বলল, তোমার গণি ভাই হারিয়েছে, নাকি তুমি হারিয়ে গেছ?

নান্টু প্রতিবাদ করে বলল, আমি তো হারিয়ে যাইনি। আমি মেলাতেই ছিলাম।

তা হলে কাঁদছ কেন?

আমি যে গণি ভাইয়ের খালার বাড়িটা খুঁজে পাচ্ছি না।

তার খালার নাম ঠিকানা জানো? গ্রামের নাম কি?

জানি না।

তা হলে তোমার গণি ভাইকে খুঁজে পাবে না। তার খালারও দেখা পাবে না।

এ কথা শুনে নান্টু আরো জোরে কেঁদে উঠল। মায়ের কথা মনে পড়ছে আবার। কেমন করে মায়ের কাছে ফিরবে নান্টু? সে যে মেলায় এসে সত্যি সত্যি হারিয়ে গেছে। আব্বা-মা কেউ তো নান্টুর হারানো খবরটা জানতেও পারছে না। ছেলেটি এসে নান্টুর মাথায় হাত রেখে বলল, কেঁদ না। তোমার বাড়ি কোন গ্রামে বলো দিকিনি।

তালতলা।

তালতলা। সে তো অনেক দূর। তা তোমার বাবার নাম কি?

নওয়াব আলী সরকার।

তোমার বাবা বুঝি অনেক বড় লোক?

হ্যাঁ। আমাদের বাড়িতে বড় বড় ছয়টা টিনের ঘর আছে। বারটা গরু আছে। পুকুর আছে। আমাদের অনেক জমি আছে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি গো, আর বলতে হবে না। তোমার পোশাক দেখেই তো বুঝেছি। তুমি ধনী মানী লোকের ছাওয়াল। তা এসেছ তো সাইকেলে। এখন কি হেঁটে বাড়িতে যেতে পারবে?

নান্টু হ্যাঁ বলবে নাকি না বলবে? কিছুই বুঝতে পারছে না সে। কান্না বন্ধ করে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে থাকল।

আমি তো তালতলার ওপর দিয়ে যাব। চলো, তোমাকে তোমাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যাব। তালতলায় গেলে বাড়ি খুঁজে পাবে তো?

নান্টু মাথা নাড়ল। তারপর জিজ্ঞেস করল, আপনি কি হেঁটে যাবেন?

ছেলেটি হেসে তার দু'পায়ে থাপড় দিয়ে বলল, আমার এই পা-গাড়ি অনেক শক্ত। মেলায় আসার সময় ভারে দু'বস্তা তরমুজ নিয়ে এসেছি। এখন না হয় তোমাকে ঘাড়ে নিয়ে যাব। চল।

নান্টুর মনে হলো, এই ছেলেটা গণি ভাইয়ের চেয়ে অনেক ভাল। বাড়িতে পৌঁছে দিলে মাকে বলে সে ছেলেটাকে ভাত খাওয়াবে। হাঁড়ির বাতাসা কদমাও দেবে দুটি। খুশি হয়ে নান্টু বলল, আমাকে ঘাড়ে নিতে হবে না ভাই। আমি হেঁটে যাব। চলেন।

গণি ভাই যেমন খারাপ, তার সাইকেলটিও তেমনি পচা। লোহার রডে বসে থাকতে থাকতে নান্টুর পেছন দিকটা সিদ্ধ হয়েছে। হাঁটতে গেলে ব্যথা করছে এখনো। সে কারণে নান্টু জোরে হাঁটতেও পারছে না। বাঁক কাঁধে ছেলেটির পাশাপাশি থাকতে হলে নান্টুকে প্রায় দৌড়াতে হয়। এতো জোরে হাঁটে কেন ছেলেটি? তার মতো হাঁটলে নান্টু যে রাস্তায় আছাড় খাবে। হাতের নকশি হাঁড়িটাও ভেঙে যাবে। তখন হেঁটে আর বাড়িতেও ফিরতে পারবে না নান্টু। তার ভীষণ খিদে পেয়েছে যে।

ছেলেটি পা থামিয়ে, ঘাড় ঘুরিয়ে নান্টুকে দেখল। বলল, এমন আস্তে হাঁটলে বাড়ি পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে কিন্তু।

নান্টু গায়ের ব্যথা এবং খিদে পাওয়ার কথা তো আর বলতে পারে না। বলল, আমার পায়ে যে জুতা। দামী চামড়ার জুতা পরে কি জোরে হাঁটা যায়?

তাহলে জুতা দুইটা খুলে নাও। জুতা আর হাঁড়িটা আমার হাতে দাও।

জুতা ও হাঁড়ি নিয়ে ছেলেটি দৌড়ে পালিয়ে যায় যদি? গণিকে বিশ্বাস করে নান্টু ঠকেছে। ছেলেটির কাছে ঠকবে না। তার চেয়ে হাঁড়ির কদমা বাতাসা খেলে নান্টুর খিদে কমবে। তখন জোরে হাঁটতে পারবে। নিজে খাওয়ার আগে নান্টু তার নতুন সঙ্গীর দিকে দুটি এগিয়ে দিল।

খান। কদমা বাতাসা খেলে আপনি বাতাসের মতো আরো জোরে হাঁটতে পারবেন।

তুমি খাও।

আমি তো খাবই। আপনিও দুটি নেন। অনেক আছে।

কদমা মুখে দিয়ে ছেলেটি নান্টুর নাম জেনে নিল। নিজের নাম বলল, মন্নাফ। কিন্তু সবাই ডাকে মনা। নান্টু বলল, আমি আপনাকে মনা ভাই ডাকব।

মনা ভাই খুশি হয়ে বলল, ভাই যখন ডাকলে, বড় ভাইয়ের ঘাড়ে চড়ে বস দিকিন। কদমা খেয়ে জোর কদমে হেঁটে যাই। তা না হলে তোমার বাড়ি যেতে বেলা ডুববে।

মনা ভাই, রাতে আমাদের বাড়িতে খেয়ে যাবেন।

তা হলে আমার বাড়ি পৌঁছতে আরো রাত হবে যে।

রাতে আমাদের বাড়িতেই থাকবেন। মা আপনাকে খুব আদর করবে, দেখবেন।

মনা ভাই হাসল। মাটিতে বসে বলল, এবার ঘাড়ে চড়। মনা ভাইয়ের ঘাড়ে চড়তে নান্টুর ইচ্ছে করছে। আবার লজ্জাও পাচ্ছে। নিজের পায়ে এতটা পথ সে হাঁটতে পারবে না। তবু ভদ্রতা করে বলল, আমি হাঁটি মনা ভাই। আপনার যে খুব কষ্ট হবে।

মনা ভাই হেসে বলল, তোমার চাইতে বেশি ওজনের তরমুজ ভারে নিয়ে তীরের মতো ছুটে এসেছি। এখন তোমাকে ঘাড়ে নিয়ে ঘোড়ার মতো ছুটে যাব। এক কাজ করো, তুমি আমার বাঁশটা ঘাড়ে নাও। তোমার হাঁড়িটা আমার হাতে দাও।

নান্টু মনা ভাইয়ের মাথার দু'পাশে পা দিয়ে তার ঘাড়ে চেপে বসল। নিজের কাঁধে মনা ভাইয়ের বাঁকটি নিয়ে বন্দুকের মতো চেপে রাখল। অন্য হাতে জড়িয়ে ধরল তার মাথা। মনা সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। তার ঘাড়ে নান্টু, হাতে ঝোলানো নান্টুর হাঁড়ি। মনা ভাই ঘোড়ার মতো ছুটতে লাগল।

নান্টু কখনো সত্যিকার ঘোড়ায় চড়েনি। যখন আরো ছোট ছিল সে, বাড়ির কাজের লোক ফয়েজ চাচা তার ঘোড়া হতো। সেই ঘোড়ায় চড়তে পারলে নান্টু

খুশিতে গুবগুব করে হাসত। সাঁতার শেখার আগে, ফয়েজ চাচা তাকে এভাবে ঘাড়ে নিয়ে পুকুরে নেমে ডুবো জাহাজ হতো। খুব মজা লাগত নান্টুর। বাড়িতে ফিরে নান্টু ফয়েজ চাচাকেও মেলার বাতাসা খাওয়াবে।

অবুঝ বাচ্চারা কারো কাঁধে বা কোলে চড়ে এমন হাসে, নান্টু তো সেরকম হাসতে পারে না। তবে সত্যিকার ঘোড়ায় চড়ার মতো মজা লাগছে তার। সাইকেলে চড়ার চেয়ে মানুষের ঘাড়ে বসে যাওয়ায় বেশি আরাম। আর মনা ভাই হাঁটছেও বেশ হেলে দুলে। রাস্তায় একটি লোক নান্টুর আরামে বাড়ি ফেরা দেখে দাঁত বের করল। বলল, বা রে বাহ! মনে হয় মেলা থেকে রাজপুত্র একটা গাধার পিঠে চড়ে বাড়ি ফিরছে।

মনা ভাই ঘোড়ার মতো চিঁহিহি করে হেসে বলল, সত্যি রাজপুত্র। আর আমি গাধা নই গো, ঘোড়া।

নান্টুর খুশি আরো বাড়ল। লোকটা আসলে মিথ্যে বলেনি। মাও বলেছে। এই নতুন জামা-জুতা পরলে তাকে রাজপুত্রের মতো দেখায়। তার ওপর নান্টুর কাঁধে এখন বন্দুক। বন্দুক নয়, বাঁকটা আসলে তলোয়ারের মতো। পথে যদি কুকুর কামড়াতে আসে, নান্টু এই তলোয়ার দিয়ে কুকুরকে ভয় দেখাবে। চোর ডাকাত যদি মনা ভাইয়ের হাতের হাঁড়িটা কেড়ে নিতে আসে, নান্টু এই তরবারি দিয়ে ক্ষতম করে দেবে।

পথে নান্টুর দিকে তাকিয়ে আরো একজন লোক জিজ্ঞেস করল, এই ছেলেটি কে রে?

মনা ভাই উত্তর দিল, এইটা আমার ছোট ভাই।

বাড়ি কোথায়?

তালতলায়।

মনা ভাইকে নান্টুর নিজের ভাই মনে হচ্ছে এখন। এই নতুন ভাইটাকে নান্টু আজ যেতে দেবে না। রাতে এক বিছানায় থাকবে দুজন। নান্টু নিচের দিকে তাকিয়ে বলল, মনা ভাই, আপনার খিদে লাগলে হাঁড়ির বাতাসা খেতে থাকবেন।

আমি সব খেলে বাড়িতে তোমার ভাই বোনেরা কি খাবে?

বা রে! আপনিও তো আমার ভাই। বড় ভাই। আমার তো আর ভাই-বোন নেই।

তুমি ধনী মানুষের ছেলে। লেখাপড়া জানো। আমি মূর্খ চাষা। আমরা খুব গরিব। আমি কি তোমার ভাই হতে পারি?

কেন পারবেন না? ভাই হতে কি পয়সা লাগে? আপনি তো ভাই হয়েছেন বলে আপনার ঘাড়ে চড়েছি।

তুমি আসলে খুব চালাক ছেলে গো। তোমার সাথে কথায় পারব না।

গল্প করা আর হাঁটা। এক জোড়া পায়ের ওপর ভর দিয়ে দু'জন মানুষের হাঁটা। গল্প ফুরিয়ে যায়। মনা ভাইয়ের হাঁটা তবু থামে না। নান্টু মাথা ঘুরিয়ে অচেনা গ্রাম লোকজন দেখে। সাইকেলে যাওয়ার সময় ভাল করে দেখেনি। নান্টুরা কি এই পথ

দিয়ে সাইকেলে গিয়েছিল? মনেও পড়ছে না তার। সেই বাজারটা দেখলে চিনতে পারবে। বাজারটার আসা মানে অর্ধেক পথ। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে গেল। বাজারটা আর কত দূরে?

মনা ভাই নান্টুকে ঘাড় থেকে নামিয়ে দিয়ে বলল, এসে গেছি। এই তোমাদের গ্রাম তালতলা। এখন বাড়ি চিনতে পারবে?

নান্টু চারদিকে তাকিয়ে দেখল। সন্ধ্যার অন্ধকারে নিজেদের গ্রামটাকে কোথাও দেখতে পেল না সে। বলল, এটা তো তালতলা না। আমাদের বাড়ি আরো দূরে।

কোন পথে যেতে হবে?

নান্টু চারদিকে তাকিয়েও চেনা রাস্তা খুঁজে পায় না। মনা জোর দিয়ে বলল, এটাই তো তালতলা। দাঁড়াও, ঐ লোকটাকে জিজ্ঞেস করি। তোমার বাবার নামটা যেন কি?

লোকটাকে মনা ভাই নান্টুর বাবার নাম বলল। কিন্তু লোকটা জানাল, তালতলায় এই নামে কেউ নেই। তখন মনা কান্দি মেলায় নান্টুর হারিয়ে যাওয়ার কাহিনী শোনাল লোকটাকে। নান্টুকে কাছে এসে ভাল করে দেখল লোকটা। জিজ্ঞেস করল, তোমার বাবার নাম গ্রামের নাম ঠিক বলছ তো খোকা?

নান্টু রেগে গিয়ে বলল, বাবার নাম কেউ মিথ্যে বলে? আমার সাকিন তালতলা, থানা কাউনিয়া, জেলা রংপুর।

লোকটা মাথায় হাত দিয়ে বলল, সর্বনাশ! সে যে বহুদূর গো! মেলা থেকে যেতে হয় উত্তরে। আর তুমি একে নিয়ে এসেছ দক্ষিণে।

কিন্তু নান্টু যে বলল, তালতলায় বাড়ি। আমি ভাবলাম এই তালতলা হবে।

আরে বোকা বলদ, তালতলা কি বাংলাদেশে একটা? যত-তালগাছ, ততো তালতলা।

এতক্ষণে নান্টু বুঝতে পারল, মনা ভাই তাকে ভুল তালতলায় এনেছে। বাড়িতে পৌঁছে দেয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে আরো দূরে এসেছে। এখন রাতের মধ্যে নান্টু কিভাবে পৌঁছবে বাড়ি? মনা ভাই যে বোকার হদ্দ। ভুল রাস্তা দিয়ে হেঁটে নান্টুকে অচেনা তালতলায় এনে ফেলেছে। রাতের মধ্যে সে কি আসল তালতলায় পৌঁছে দিতে পারবে? নান্টু হারিয়ে গেলে আব্বা-মা ভীষণ চিন্তা করবে। মা রাতে ঘুমাতেও পারবে না। শুধু কাঁদবে। আর মায়ের জন্য কেনা বাতাসা-কদমা কে খাবে?

বাড়ির কথা ভেবে নান্টুর বুক ভেঙে গেল। লজ্জা ভুলে শব্দ করে কাঁদতে লাগল সে। কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি বাড়ি যাব। আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দাও। নইলে মা কাঁদবে।

নান্টুর কান্না শুনে রাস্তার ধারের বাড়ি থেকে লোকজন ছুটে এল। ছোট, বড়, মাহিলা, পুরুষ সবাই ঘিরে ধরল নান্টুকে। হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে মজা করে দেখছে তারা। অবশ্য মুখে আহা-উহ্ করছে অনেকে। মনার কাছে মেলায় নান্টুর হারিয়ে যাওয়ার গল্প শুনছে বারবার। নান্টু শুধু কাঁদছে। কান্না দেখিয়ে সবার কাছে তার একটাই বায়না, আমি বাড়ি যাব। আমাকে বাড়ি পৌঁছে দাও।

মনারও কাঁদি কাঁদবো অবস্থা। লোকগুলিকে বলল, এখন আমি কী করি কন দিকিন। উপকার করতে গিয়ে ছেলেটাকে নকল তালতলায় আনলাম।

একজন লোক বলল, চেহারা দেখে চেনা যায়। কথা শুনে বোঝা যায়, এ ছেলে মান্যগণ্য মানুষের ছাওয়াল। একে আমাদের চেয়ারম্যানের বাড়ি পৌঁছে দাও। তিনি একটা বুদ্ধি দিয়ে ব্যবস্থা করবেন।

লোকটার কথা সমর্থন করল সবাই। আরেকটি লোক নান্টুর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, কাঁইদো না বাবা। বাবার নাম ঠিকানা যখন কইতে পারো, একদিন না একদিন বাড়ি পৌঁছতে পারবা।

মনা ভাই নান্টুর হাত ধরে বলল, চল নান্টু ভাই, তোমারে চেয়ারম্যানের বাড়ি লইয়া যাই। কাঁদ না ভাই। মনটাকে শক্ত করো।

মনা ভাইয়ের কথা শুনে নান্টুর কান্নার আওয়াজ থামল। তার হাত ধরে অন্ধকার রাস্তায় হাঁটতে লাগল। কিছুদূর হাঁটার পর মনা কান্না-ভেজা কণ্ঠে বলল, তোমাকে চেয়ারম্যানের বাড়িতে রেখে গেলে রাতে আমার ঘুম হবে না। কত আশা করে ঘাড়ে নিয়ে এলাম। তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেব। আর কী জ্বালার মধ্যে পড়লাম!

আমাকে চেয়ারম্যানের বাড়িতে রেখে আপনি কোথায় যাবেন?

আমি বাড়িতে যাব। এখান থেকে আরো দু'মাইল দূরে। বজরার চরে আমার বাড়ি।

নান্টু বুঝতে পারল, অচেনা জায়গায় তাকে একলা রেখে মনা ভাইও হারিয়ে যাবে। তারপর কী হবে? ভীষণ ভয় করতে লাগল তার। হাঁটা বন্ধ করে বলল, আমি কোনো চেয়ারম্যানের বাড়িতে যাব না।

তাহলে কি আমাদের বাড়িতে যাবে? আমরা যে খুব গরিব মানুষ। তোমার খাতির যত্ন করতে পারব না।

আমার খাতির-যত্ন লাগবে না। আমাকে শুধু বাড়িতে পৌঁছে দেবেন।

ঠিক আছে। আজ রাতটা আমাদের সঙ্গে থাক। তারপর কাল দিনে দেখব কি উপায় করা যায়। এখন আগের মতো আমার ঘাড়ে উঠে বস দিকিন। নইলে অন্ধকারে আছাড় খাবে।

নান্টু আবার বাঁক কাঁধে নিয়ে মনার ঘাড়ে চড়ে বসল। মনা ভাই অন্ধকার ভেদ করে ছুটতে লাগল। আগের চেয়েও জোরে। কিন্তু মনা ভাইয়ের ঘাড়ে চেপে আগের মতো ঘোড়ায় চড়ার খুশি লাগছে না নান্টুর। কারণ সে জেনে গেছে, মনা ভাই তাকে রাতের মধ্যে মায়ের কাছে পৌঁছে দেবে না। পরিচিত গ্রাম বাড়ি ঘর পেছনে রেখে, নান্টু এখন এক অচেনা জগতে হারিয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারে চুপি চুপি হারিয়ে যাচ্ছে। ওদিকে মা হয়তো রাস্তায় দিকে তাকিয়ে আছে। ভাবছে, এই বুঝি নান্টু ফিরে এল। কিন্তু নান্টু তো রাতে ফিরতে পারবে না। কখন কিভাবে ফিরবে, তাও জানে না। আব্বা কি সাইকেল নিয়ে নান্টুকে খুঁজতে বেরিয়েছে? যতই খুঁজুক, আব্বা তাকে খুঁজে পাবে না। কারণ অন্ধকারে আরো বেশি করে হারিয়ে যাচ্ছে নান্টু। কোথায় যাচ্ছে তা সে

নিজেও জানে না। নান্টুকে খুঁজে না পেয়ে আব্বা মায়ের ওপর রেগে যাবে। মা কেন তাকে মেলায় আসতে দিল? খুব রেগে গেলে আব্বা মাকে মারতেও পারে।

মনা ভাই হঠাৎ চমকে উঠে বলল, আমার কপালে পানি পড়ল। ও নান্টু ভাই, তুমি এখনো কাঁদছ? কেঁদ না আর। কাঁদলে কিন্তু ভূতে ধরবে। সামনের বটগাছে কাঁদুনি ভূত আছে।

নান্টু শব্দ করে কাঁদছিল না। আব্বা-মার কথা ভেবে চোখ থেকে পানি ঝরে পড়ছিল। নান্টু ভূতের কথা শুনে জামার আস্তিন দিয়ে চোখ মুছল। মনা ভাই তাকে কি মিছেমিছি ভয় দেখাচ্ছে? নাকি সত্যি?

মনা ভাই আপনাদের দেশেও ভূত আছে?

নেই মানে! ঐ বটগাছের কাঁদুনি ভূতটা ইনিয়ে বিনিয়ে শুধু কাঁদে। ভয় পেলে আরো ভয় দেখায়। আমি ওর কান্না না শোনার জন্যে বটগাছের নিচ দিয়ে যাওয়ার সময় চেঁচিয়ে গান গাই। গান ধরলে শয়তানটা কাছে আসতে পারে না।

নান্টু তবু বুঝতে পারছে না, মনা ভাই সত্যি বলছে? নাকি ঠাট্টা করছে? চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। জন-প্রাণীর সাড়া নেই। এ রকম চুপচাপ অন্ধকার দেখলে নান্টুর এমনিতে ভয় করে। ঠিক এরকম সময়ে তাদের বাড়ির পেছনে তেঁতুল গাছে ভূতের হাসি শুনেছিল নান্টু। ভয়ে গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তার। কাঁদুনি ভূতের কথা শুনে নান্টুর ভয় করতে লাগল। ভূতটা যদি এখন সামনে এসে দাঁড়ায়? কাঁদের বাঁকটা দিয়ে নান্টু ভূতকে খোঁচা দিতে পারবে? ভূত তো আর কুকুর বিড়াল নয়। মারলেও তার লাগবে না। ভয়ে নান্টু কেঁপে উঠল। মনা ভাইয়ের মাথা শক্ত করে পেঁচিয়ে ধরল সে।

নান্টু চোখ বন্ধ করল। কিন্তু কান দুটি খোলা। কাঁদুনি ভূতের গলা ঠিকই তার কানে আসবে। নান্টু তাই বলল, ও মনা ভাই, আপনি চেঁচিয়ে গান করেন তো। শুনি আপনার কেমন গলা।

মনা ভাই বলল, ঠিক আছে। তাহলে আমার সাথে তুমিও গান ধর।

মনা ভাই গান ধরল ঃ

ফাঁদে পড়িয়া বগা কাঁদে রে
ফাঁদে বসাইছে ফাঁদুয়া রে ভাই,
পুঁটি মাছও দিয়া
পুঁটি মাছের লোভে রে বগা
পড়ল উড়াল দিয়া...

এই ভাওয়াইয়া গান নান্টু তাদের গ্রামে আগেও শুনেছে। মনা ভাইয়ের সঙ্গে কাঁপা কান্না গলায় সেও গাইতে লাগল, ফাঁদে পড়িয়ে বগা কাঁদে রে.....

খড়ের তৈরি একটা ঘরের সামনে নান্টুকে ঘাড় থেকে নামিয়ে দিল মনা। মাকে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল।

ও মা, দেখ মেলা থেকে তোমার জন্যে কী জিনিস এনেছি।

আর আমার জন্যে কি এনেছিস ভাই?

তোর জন্য একটা রাজপুত্র এনেছি। দেখ এসে।

ঘর থেকে বেড়িয়ে এল মনার মা ও বোন। মনার মায়ের হাতে কেরোসিনের কুপি। তার বোনটির বয়স নয়/দশ হবে। নান্টুর সমান লম্বা। খালি গা! কেরোসিনের কুপির আলো নান্টুর সামনে ধরে মনার মা ও বোন অবাক। যেন এমন আজব জিনিস তারা আর দেখেনি। তাজ্জব হয়ে শুধু চেঁচাতে লাগল, ও মনা। এটা কার ছেলে গো? কোনখান থেকে ধরে আনলি?

মনা রেগে বলল, আগে মেহমানকে খেতে দাও। বড্ড খিদে লেগেছে। খাওয়ার পর সব বলব। চল নান্টু ভাই, ঘরে চল।

ঘরে ঢুকে মনা ছোট বোনকে ধমক দিল।

ও নূরী, এখনও হাঁ করে কি দেখছিস! বসার জন্য পিঁড়ি দে। হাতমুখ ধোয়ার পানি দে। পাখা দিয়ে বাতাস কর।

নূরী তবু দাঁড়িয়ে থেকে বলল, আগে বলনা ভাই, এইটা কে? আমার কি হয়?

বললাম না, এইটা রাজপুত্তর। কথা না শুনলে তোকে গুলি করে দেবে।

নূরী ভয় পেয়ে দৌড় দিল। নান্টুকে পিঁড়ি এনে দিল বসার জন্য। একটা বাঁশের পাখা দিয়ে নান্টুকে বাতাস করতে লাগল। পাখাটা ঘোরার সঙ্গে ক্যারক্যার আওয়াজ হচ্ছে। কুপির শিখা পতপত করে কাঁপতে লাগল। পিঁড়িতে বসে নান্টু তার জুতার দিকে তাকাল। ধুলো লেগে সাদা হয়ে গেছে। প্যান্টেও ধুলা ভরেছে। নান্টু কি ধুলা মোছার জন্যে মেয়েটার কাছে একটা ন্যাকরা চাইবে?

মনা ভাই বাইরে থেকে হাত মুখ ধুয়ে এল। গামছা দিয়ে হাত মুখ মুছতে মুছতে বলল, নান্টু ভাই, জুতাটা খুলে ফেল। জামা প্যান্টও খুলে ফেল। আরাম লাগবে।

নান্টু বলল, আমি যে হাফ-প্যান্ট আনি নি।

মনা বলল, ঠিক আছে। ওগুলি খুলে তুমি আমার একটা লুঙ্গি পর। নূরী দে তো, লুঙ্গিটি এনে দে।

জামা-কাপড় খুলে নান্টু লুঙ্গি পরল। লুঙ্গি তো সে কখনও পরে না। তার ওপর মনা ভাইয়ের লুঙ্গিটা বেশ বড়। পেটের ওপর লুঙ্গির পেঁচানো বড় একটা গিঁট দেখে নূরী খিক খিক করে হাসতে লাগল।

ও ভাই দেখ, লুঙ্গি পরতেও পারে না।

লুঙ্গি কি ও কখনো পরেছে? যাও নান্টু ভাই, হাত মুখ ধুয়ে আস। গরিবের ঘরে ভর্তা-ভাত খাও।

নূরী উঠানে প্লাস্টিকের বদনায় পানি এনে দিল। হাত-মুখ মোছার জন্যে গামছা হাতে দাঁড়িয়ে দেখল, নান্টু কিভাবে হাত-মুখ ধোয়। নান্টু মুখে পানি নিয়ে কুলকুচা করার সময় কোনো শব্দ করল না। মেয়েটি যদি আবার ভুল ধরে।

ঘরে মনা ভাই তখন নান্টুর হারিয়ে যাওয়ার গল্প বলছে মাকে। নান্টু ঘরে ঢুকতেই মনার মা তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল, মায়ের বুক খালি করে আমাদের ঘরে এলে সোনামনি। তোমার মা যে রাতে ঘুমাতে পারবে না।

মায়ের কথা মনে করিয়ে দেয়ায় নান্টুর মন খারাপ হলো। মনা ভাইয়ের মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকল। নান্টুর মা যে সারা রাত ঘুমাতে পারবে না। মনার মা জানল কি করে?

মনা ভাই তার মাকে ধমক দিয়ে বলল, সারা রাস্তায় নান্টু কেঁদেছে। এখন আবার ওকে কাঁদাতে বসলে। আগে ভাত দাও দিকিনি।

মনা ভাইয়ের মা তাড়াতাড়ি পাটি বিছিয়ে দিল। নান্টুকে বসিয়ে দিয়ে ভাত বাড়তে লাগল। শুধু মিষ্টি কুমরোর তরকারি। আর ঠাণ্ডা ভাত। সকালে মেলায় আসার আগে মা নান্টুকে জোর করে নিজের হাতে খাইয়ে দিয়েছিল। মুরগির মাংস দিয়ে কয়েক গ্রাস ভাত খেয়েছিল মাত্র। সারাদিন নান্টু আর ভাত খায়নি। মিষ্টি কুমরো নান্টু বেশি পছন্দ করে না। তবু তাই দিয়ে ভাত মেখে খেতে লাগল সে।

এতক্ষণে নূরীর চোখ পড়েছে নান্টুর নকশি হাঁড়িটার দিকে। ভাইকে জিজ্ঞেস করল, ও ভাই, এটা কার? কী আছে এর ভেতর?

মনা ভয় দেখাল, খবরদার ওটা নাড়বি না। ওর ভেতরে কুমির আছে।

কুমির আছে নদীতে। হাঁড়িতে কখনও কুমির থাকে? তোমার খালি মিছে কথা।

মিথে কথা নয়। সত্যি কথা।

নান্টু বুঝল, নূরী বিশ্বাস করেনি। রাতে যদি সে চুপি চুপি হাঁড়ির বাতাসা কদমা খেয়ে ফেলে? নান্টু তাই নূরীকে আরো ভয় দেখিয়ে বলল, কুমিরটা কামড়ায় কিন্তু।

সকালে ঘুম ভাঙলেও নান্টু চোখ খোলে না। তার আরো ঘুমাতে ইচ্ছে করছে। ঘুমের ঘোরে নান্টু ভুলে গেছে যে, সে হারিয়ে গেছে। বরং মনে হচ্ছে, নিজেদের ঘরে খাটের ওপর শুয়ে ঘুমাচ্ছে সে। মা তার পাশে শুয়ে আছে। তন্দ্রার ঘোরে মেলার কথা মনে পড়ল। মেলায় হারিয়ে গিয়ে অনেক কষ্ট হয়েছিল তার। গায়ে ব্যথা হয়েছে। পায়ে ফোস্কা পড়েছে। সে জন্যে নান্টু আজ অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমাবে। সকালে পড়তেও বসবে না। মেলা থেকে আনা বাতাসা-কদমা মা সব খেয়ে ফেলেছে? আর কুমিরটা?

তন্দ্রার ঘোরে নান্টু দু'বার মাকে ডাকল। তারপর চোখ মেলেই ধরমর করে উঠে বসল বিছানায়।

প্রথমে চোখে পড়ল নূরীকে। নান্টুর দিকে তাকিয়ে আছে। নান্টু লজ্জা পেল। কারণ ঘুমের ভেতর কখন যে লুঙ্গিটা খুলে গেছে! তাড়াতাড়ি লুঙ্গিটা ঠিক মতো পরল সে। নূরী তার মাকে ডাকতে লাগল। নান্টু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখতে লাগল সব। বাড়ির খাটের বদলে, একটা বাঁশের মাচায় ময়লা কাথার ওপর রাতে ঘুমিয়েছে সে।

ঘরের সব কিছু নতুন। হারিয়ে যাওয়ার কথা মনে পড়তেই বুকখানা ধক করে উঠল তার।

নূরীর মা এসে বলল, উঠেছ সোনা-মানিক? মুখ ধুয়ে পান্তা খাও। বাড়িতে না জানি কত কি খেতে। আমরা গরিব মানুষ বাবা।

নান্টুর পেশাব ধরেছে। ঘর থেকে বেরিয়েই সে বুঝল, একটা অচিন দেশে এসে গেছে। রাতে দেখতে পায়নি। দিনের আলোয় সব কিছু নতুন। মনা ভাইদের বাড়িতে দুটি খড়ের ঘর, ছোট্ট উঠান। একদিকে কলা গাছের ঝোপ। বাড়ির বাইরে বাঁধা একটা দামরা গরু। ক্ষেতের মধ্যে তরমুজের ডাল। পাতার ফাঁকে কয়েকটা বড় তরমুজ ধরেছে। নান্টু পেশাব করার জায়গায় খুঁজে পাচ্ছে না। দু'টি ক্ষেত পেরিয়ে আলের ধারে বসল সে। ক্ষেতের মধ্যে বালু-মাটি, নান্টুর পেশাব শুষে নিল। চারদিক তাকিয়ে নান্টু তাদের গ্রামে যাওয়ার রাস্তা খুঁজতে লাগল। কোনো বড় রাস্তা নেই এখানে। নান্টুদের তালতলা যেমন সবুজ, বড় গাছপালা ঘেরা, এ গ্রামটা মোটেও সেরকম নয়। এখানে নান্টুদের বাড়ির মতো বড় বাড়ি একটিও নেই। সব খড়ের তৈরি, ছোট ছোট বাড়ি। সামনে একটি ফাঁকা চর। বালি চিকচিক করছে। আরে! ওটা নদী নাকি? নান্টুদের গ্রামে খাল-বিল পুকুর আছে কিন্তু নদী নেই।

নূরীকে জিজ্ঞেস করল সে, মনা ভাই কোথায়?

ভাই নদীতে মাছ ধরতে গেছে। যাবে তুমি?

আমি বাড়িতে যাব।

তোমার বাড়ি তো বহু দূরের দেশে। সেথা হেঁটে যাওয়া যাবে না।

মেয়েটা এমনভাবে কথা বলছে, যেন নান্টুর বাড়িঘর তার বেশ চেনা। অবশ্য মিথ্যে বলেনি সে। নান্টু কখনও অতদূর হেঁটে যেতে পারবে না। কিন্তু তাকে ঘাড়ে নিয়ে যেতে পারবে না মনা ভাই?

আমি মনা ভাইয়ের কাছে যাব।

চল, তোমাকে নিয়ে যাই। ঐ তো সামনে নদী।

নান্টুদের গ্রাম পেরিয়ে একটা নদী আছে। সে নদীতে ঢেউ নেই, পালতোলা নৌকা নেই, পাড়ে বালুচরও নেই। কিন্তু মনা ভাইদের নদীটা নিশ্চয় বড় হবে। চরটাও বেশ বড়। খালি পায়ে বালুর ওপর দিয়ে হাঁটতেও আরাম লাগে। সে জন্য নূরী কি সারাদিন ছুটে ছুটে নদীতে যায়? নান্টু তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের নদীতে কুমির নেই?

কুমির তো তোমার হাঁড়িতে।

কথাটা বলে নূরী খিকখিক করে হাসতে লাগল। হাসি ঢাকার জন্যে মুখে হাত-চাপা দিল। নান্টু ভাবল, সর্বনাশ। হাঁড়ির মিঠাইগুলি কি পাজী মেয়েটা চুপিচুপি খেয়ে ফেলেছে? নইলে মুখ ঢেকে হাসছে কেন?

খানিকটা হাঁটার পর নদী চোখে পড়ল। নদীটা বেশি চওড়া নয়। কিন্তু নদী ভরা রূপালী রঙের ঢেউ। ছলাৎছল বইছে। ওপারে ধু-ধু চর। কাঁশ বন। একটা লোক হেঁটেই পার হচ্ছে নদীটা।

নান্টু বলল, তোমাদের নদীতে এত কম পানি কেন?

নূরী বলল, এইটা ছোট নদী। ঐ চরের ওপারে বড় নদী। বানের সময় এটাও বড় নদী হয়ে যায়। আমাদের ঘরে পানি ঢোকে।

তা হলে তোমরা বাড়িতে থাক কিভাবে?

পানির মধ্যে থাকি। ঘর ডুবে গেলে বাঁধের মধ্যে গিয়ে থাকি।

নান্টু ভাবল বানের সময় এখানে বুঝি বেশ মজা হয়। নদীটা সমুদ্রের মতো বড় হয়ে যায়। অবশ্য ছোট নদীটাকে দেখতে বেশ ভাল লাগছে নান্টুর। একটা মাছরাঙা পাখি নদীর ওপর উড়ছে। দূরে জাল দিয়ে মাছ ধরছে মানুষ। কিন্তু মনা ভাই কোথায়?

নূরী বলল, ভাই ঐ দিকে গেছে। ঐ যে জাল ছুড়ে মারছে।

নূরী ভাইয়ের কাছে যাওয়ার জন্যে ছুটতে লাগল। নান্টু লুঙ্গি পরে দৌড়াতে পারে না। তাছাড়া এটা কি তার চেনাজানা গ্রাম যে, নান্টু সবখানে ছুটে যাবে? এমনিতে হারিয়ে যাওয়ার পর থেকে নান্টুর ভীষণ মন খারাপ হয়ে আছে।

মনা ভাই নান্টুকে দেখে ঝাকি জাল হাতে নিয়ে চেঁচাতে লাগল।

ও নান্টু ভাই। আস, আস। তোমার জন্যে মাছ মারছি। কেমন লাগছে আমাদের দেশটা?

নান্টু বলল, মনা ভাই, আমাকে বাড়িতে নিয়ে চলেন। দেরি হলে মা তো খুব চিন্তা করবে।

তোমার বাড়ি যে সাত সমুদ্র তের নদী ওপারে। হেঁটে যাওয়ার সাধ্য নেই কারো।

নান্টুর আবার কান্না পাচ্ছে। কাঁদার আগে মনা ভাইকে সে বোঝাতে চেষ্টা করল, রাস্তায় তো কোনো সমুদ্র নদী নেই। আর আমাকে কাঁধে নিতে হবে না। হেঁটে যেতে পারব।

তোমার আসলে খুব সাহস। এখন চল ঘরে যাই। মা কি বলে দেখি। মা তো তোমার জন্য সাত সকালে মাছ মারতে পাঠিয়েছে আমায়।

নূরী খালইটা হাতে নিয়ে নান্টুকে দেখাল। এই দেখ, কত বড় ইছা আর বাইলা মাছ পেয়েছে। মা তোমাকে রেঁধে দেবে।

নান্টু ও নূরীকে নিয়ে মনা বাড়ি ফিরল। তার মা হেসে বলল, আমি ভাবছি হারানো ছেলেটা আবার কোথায় হারাল গো! নদী দেখতে গেছিলে সোনা মানিক?

নান্টু মাথা নাড়ল। মনা ভাইয়ের মা একটা পচা শাড়ি পরেছে। গায়ে ব্লাউজ নেই। মাহিলাটি নান্টুকে যতই আদর দেখাক, মায়ের কথা কি নান্টু কখনও ভুলতে পারবে? কখনো নয়।

মনার মা পান্তাভাত বেড়ে দিয়ে খেতে বলল। নান্টু পান্তা ভাত খায় না কখনো। কিন্তু এটা নিজের বাড়ি নয়। নান্টু অন্য কিছু খাওয়ার জন্যে কার কাছে বায়না ধরবে? মনা ভাইয়ের সঙ্গে নান্টু পান্তা ভাত খেতে বসল।

নূরী চেঁচিয়ে বলল, হায় আল্লা! মুখ না ধুয়ে পান্তা খায়। এটা কোন আজব দেশের ছেলে গো!

নান্টু বেশ লজ্জা পেল। সত্যি তো, ঘুম থেকে ওঠার পর এখনও সে দাঁত ব্রাশ করেনি। মুখ ধোয়নি। বাড়িতে বিছানা ছাড়ার পরই লাল টুথ ব্রাশটা মুখে নিয়ে নান্টু বাইরে যায়। আব্বা শহর থেকে তাকে ঐ ব্রাশটা এনে দিয়েছে। গ্রামে কেউ অমন সুন্দর ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজে না। নান্টু তাই সকালবেলা সবাইকে দেখিয়ে দাঁত ব্রাশ করে। কিন্তু এখানে সে কি দিয়ে দাঁত ঘষবে? নূরীর দিকে তাকিয়ে রাগ করে সে বলল, কি দিয়ে দাঁত মাজব? এখানে কি আমি ব্রাশ এনেছি?

চুলার ছাই দিয়ে ঘষ। আমরা ছাই মাজি, তাতে দাঁত কি সুন্দর হয়। এই যে দেখ।

নূরী নির্লজ্জের মতো তার দাঁত দেখাল। নূরীর দাঁত ঝকঝক করলে হবে কি, ওর গায়ের রঙ ময়লা। নান্টুর চেয়ে সামান্য লম্বা। তবু ওকে নান্টু আপা ডাকবে না।

ঠিক আছে নান্টু ভাই, আজ এমনি মুখ ধুয়ে নাও। পরে তোমাকে আমি নিমের ডালের ব্রাশ বানিয়ে দেব।

নূরী দৌড়ে বদনায় পানি এনে দিল। নান্টু তার দিকে না তাকিয়ে মুখ ধুল। তারপর পিঁড়িতে বসে পান্তা ভাত খেতে লাগল। মনা ভাইয়ের দেখাদেখি পান্তাভাতে শুকনো পোড়া মরিচ আর লবণ মাখতে লাগল।

মনা ভাই ভাত মুখে তার মাকে বলল, নান্টু যে আবার বাড়ি যাওয়ার জন্য বায়না ধরেছে। একে নিয়ে এখন কি করি মা? এদিকে আমার কামের বেলা যায়।

মনার মা বলল, তুই কামে যা। আমি দুপুরে ওকে নিয়া মাতবরের বাড়ি যাব। দেখি সে কী বুদ্ধি দেয়।

নান্টুর আবার মন খারাপ হলো। দু'গ্রাস পান্তা ভাত খেল মাত্র। ঝাল লাগছে বলে পান্তাভাতে পানি ঢেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। মনা ভাই আসলে তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে না। তার সাথে গেলে আবার সে হয়তো ভুল তালতলায় নিয়ে যাবে। তার চেয়ে নান্টু লোকজনকে জিজ্ঞেস করে একাই যাবে। নান্টু ঘরে জামা প্যান্ট ও হাঁড়িটা খুঁজতে লাগল।

কী হলো জাদু সোনা, আমাদের বাড়িতে তোমার মন টিকছে না?

আমার জন্যে মা তো বাড়িতে কাঁদছে। মনা ভাইকে যেতে হবে না। আমি একাই যেতে পারব। আমার জামা-প্যান্ট কই?

কথা শোনো। এইটুকু ছেলে নাকি ত্রিশ-চল্লিশ মাইল পথ হেঁটে যাবে! তা হলে যে আবার হারিয়ে যাবে সোনা মানিক। তোমার মা আর তোমাকে খুঁজে পাবে না।

মায়ের কথায় সায় দিয়ে নূরী বলল, তাছাড়া ঐদিকে ছেলেধরা আছে। তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে। রাস্তায় পাগলা কুত্তাও কামড় দেবে। ঠিক না মা?

নান্টু কটমট করে নূরীর দিকে তাকাল। নিজের গ্রামে হলে, বজ্জাত মেয়েটাকে নান্টু এতক্ষণে মার দিত। রাগ দেখিয়ে বলল সে, আমি কি একদম কচি খোকা? ছেলেধরা ধরতে এলে আমি চেঁচাতে পারব না?

মনা ভাই হেসে বলল, শুনলে মা। বলেছি না নান্টু বড় বুদ্ধিমান ছেলে। কথায় ওর সাথে পারা যায় না।

নূরী বলল, বেশি বুদ্ধি দেখে তো মেলায় এসে হারিয়ে গেছে। একা গেলে আবার হারিয়ে যাবে।

মনা ভাই ধমক দিল, এই বাঁদরী মেয়ে তুই চুপ কর। তারপর নান্টুর মাথায় হাত দিয়ে বলল, তোমাকে আর হারিয়ে যেতে দেব না নান্টু ভাই। যেমন করে হোক তোমার বাবা-মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করব। আমি কামে গিয়ে সবাইকে বলব। দেখি কেউ তোমার বাবাকে চেনে কি না। খবর পেলে তোমার বাবা নিজেই ছুটে আসবে।

মনা ভাই হাতে ঘাস নিড়ানো একটা খুরপি নিল। কাঁধে গামছা নিল। সারাদিন মাঠে কাজ করবে সে। নান্টু ঘরে বসে করবে কী?

মনা ভাই, আমিও আপনার সাথে কামে যাব।

আরে পাগল! আমি তো পরের ক্ষেতে ভুঁই নিড়ানো কামলা দিতে যাব। রোদে গেলে তোমার শরীর খারাপ করবে। তুমি ঘরে শুয়ে আরাম করো। আমি সাঁঝের বেলা চলে আসব। ও মা, নান্টুকে একটা তরমুজ কেটে দিও।

মনা ভাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে নান্টুর আরো মন খারাপ হলো। নূরী মেয়েটা তার দুঃখ দেখে যেন মজা পায়। এতে তার আরো খারাপ লাগে।

আবার নদীতে যাবে? নদীতে হাত দিয়েও মাছ ধরা যায়। যাবে?

নান্টু জোরে মাথা নেড়ে না বলল।

চল, আমাদের গরুটা নিয়ে ঐ দূরের মাঠে যাই।

নান্টু আবার জোরে মাথা নাড়ল। সে কি এদের বাড়ির চাকর? বাড়িতে নান্টুদের কত গরু। সব চাকররা দেখাশোনা করে। নূরী তাকেও বুঝি চাকর ভেবেছে।

নূরীর মা বলল, আবার বুঝি বাবাজি বাড়ির কথা ভাবছে। চল তোমাকে মোড়লের বাড়ি নিয়ে যাই। দেখি সে কী পরামর্শ দেয়।

নূরী বলল, আমিও যাব মা। রাজপুত্তরকে লুঙ্গি পরিয়ে নিয়ে যেও না। তা হলে, কেউ চিনতে পারবে না। তোমার জামা-প্যান্ট গুছিয়ে রেখেছি। দাঁড়াও এনে দিচ্ছি, আগে পরো।

নূরী দৌড়ে নান্টুর জামা-প্যান্ট আর জুতা এনে দিল। জুতার ধুলো ঝেড়েছে সে। কিন্তু ভেজা ভেজা লাগছে কেন? হাতে নিয়ে নান্টু তার জুতায় কেরোসিন তেলের গন্ধ পেল। নূরী কেরোসিন তেল দিয়ে দামী জুতা মুছেছে। বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে জুতা জোড়ার। ভীষণ রাগ চেপে রাখতে পারল না নান্টু।

কেরোসিন তেল দিয়ে মানুষ জুতা পরিষ্কার করে! জীবনে চামড়ার জুতা দেখনি?

নূরী ভয় পেল। নান্টু তার মাকে বিচার দিল, দেখেন আপনার বাঁদরী মেয়ে আমার জুতা নষ্ট করে দিয়েছে।

নূরীর মা মাফ চাইল।

না জেনে ভুল করেছে বাবা। ওরে মাফ করে দাও।

নূরীর মুখটা কাঁদো কাঁদো হয়েছে। দেখে নান্টুর রাগ কমল। বোকা মেয়েটাকে বুঝিয়ে বলল, চামড়ার জুতা পরিষ্কারের জন্য কালি ব্রাশ আছে। ব্রাশ করলে চক চক করে।

জামা জুতা পরে নান্টু মনা ভাইয়ের মায়ের সঙ্গে বের হলো। নূরী যাবে না। রাগ করেছে সে। বাছুর-গরুটার দড়ি হাতে নিয়ে নূরী নদীর দিকে হাঁটতে লাগল। নান্টুর দিকে আর ফিরেও তাকাচ্ছে না। নান্টুকে নিয়ে নূরীর মা মোড়লের বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল।

পথে অনেকবার থামতে হলো। যে দেখে সেই জিজ্ঞেস করে নান্টুর কথা। মনার মায়ের কাছে সব শুনেও তাদের মন ভরে না। অনেকে ছুটে এসে চোখ লাগিয়ে দেখতে লাগল নান্টুকে। জামা নেড়ে দেখল, মাথা নেড়ে দেখল, মুখে জিজ্ঞেস করল নানা কথা। জবাব দিতে দিতে বিরক্ত হলো নান্টু। ভাবল, নূরীটা সঙ্গে থাকলে ভাল হতো। নান্টুর হয়ে সেই সব কথার জবাব দিতে পারত।

মোড়লের বাড়িটা ভাল লাগল না। মনা ভাইয়ের মা বলেছিল, মোড়ল মস্ত বড় লোক। নান্টু বাড়ি দেখে বুঝল, মোড়ল নান্টুদের চেয়েও গরিব। বাড়িতে মাত্র দুটি টিনের ঘর। আর মোড়ল নিজেই খড়ের গাদায় গরু বাঁধছে। মোড়ল মানুষ গরু চড়ায় কখনো?

নান্টুকে দেখে মোড়ল এবং তার বাড়ির ছোট বড় সকলেই তাজ্জব হলো। কিন্তু কেউ নান্টুর দুঃখ বুঝল না। সব শুনে মোড়ল হুকো টানতে লাগল। হেসে বলল, চিন্তার কোনো কারণ নেই মনার মা। এ ছেলের বাপ মাকে তোমাদের খুঁজতে হবে না। ছেলের বাপই একদিন ছেলেকে খুঁজে বের করবে।

মোড়লের বুদ্ধি নান্টুর একদম পছন্দ হলো না। বলল, আব্বা তো জানে না আমি এখানে আছি। কিভাবে খুঁজে বের করবে?

মোড়ল পান-চিবানো দাঁত বের করে হাসতে লাগল। যেন নান্টু মজার কথা বলেছে।

রেডিয়ো শোনো নাই? আমার বাড়িতেও রেডিয়ো আছে। রেডিয়োর খবরের মতো তোমার হারানো-খবরও বাতাসে রাষ্ট্র হয়ে যাবে। তখন তোমার বাপ বজরার চরে ছুটে আসবে।

মনার মা বলল, ছেলেটা মায়ের কাছে যাওয়ার জন্যে খালি কাঁদে। মনাকে ছাড়া এক দণ্ড থাকতে চায় না।

মোড়ল বুদ্ধি-ভরা মাথাটা দুলিয়ে বলল, হুম। তোমার মনার বিরুদ্ধে এই ছেলের বাপ থানায় কেস করে দেবে।

কেন আমার মনার দোষ কি?

তোমার মনা এই ছেলেকে বাড়িতে আনল কেন? মানুষের ছেলে মেলায় হারাক, না হয় মরুক, তাতে তোমার মনার কী?

মনার মা ভয়ে পেয়ে বলল, এখন আমি কি করি মোড়ল সাব?

মোড়ল আবার মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, হুম। ছেলেটারে আমার বাড়িতে রেখে যাও। আর মনারে বল, কান্দির আশ-পাশ সব হাটে যেন সে যায়। কারণ এ ছেলের বাপ হাটে হাটে ঢোল দেবে। ঢোল শুনলে ছেলের পিতার হদিশ পাবে। তখন মনাকে আমার কাছে আসতে বলো। ততদিনে হারানো জিনিস আমার বাড়িতে থাকুক।

নান্টু জোর দিয়ে বলল, না। আমি এ বাড়িতে থাকব না।

মনার মা ছলছল চোখে নান্টুর দিকে তাকিয়ে বলল, থাক বাবা জাদু মানিক। আমরা গরিব। এখানে থাকলে ভাল খেতে পারবে। পরতে পারবে।

নান্টু মনার মায়ের হাত চেপে ধরে বলল, না, আমি এখানে থাকব না। আপনি চলেন। আমরা যাই।

মোড়ল নান্টুর দিকে তাকিয়ে বলল, ঠিক আছে। নিয়ে যাও। পরের ছেলেকে জায়গা দিয়ে বিপদে পড়লে আমার কাছে এস না আবার।

মনার মা বলল, মনা কাম থেকে ফিরুক। তারপর দেখি সে কী করে। চল সোনা, এখন ঘরে চল।

মনা ভাইদের বাড়িটা নান্টু দূর থেকে চিনতে পারে। এই চরে একা ঘুরলেও নান্টু আর হারাবে না। নূরীদের বাড়ি খুঁজে পাবে। তাদের গ্রামে ফয়েজ চাচার বাড়ি যে রকম, মনা ভাইয়ের বাড়ি সে রকম। চেনা ঘরে ঢুকে নান্টু নিজে জামা-জুতা ছাড়ল। ফুল প্যান্টটা খুলল না। লুঙ্গি পরতে তার ভাল লাগে না।

নূরী দূর থেকে নান্টুকে আড় চোখে দেখেছে। আগের মতো কাছে আসছে না। হেসে কথাও বলছে না। আসলে নান্টুর বকা খেয়ে রাগ করেছে। জুতা জোড়া তো সে একদম নষ্ট করেনি। তবু নান্টুর যে কেন অমন রাগ হলো! মোড়লের বাড়ি থেকে ফেরার পর নূরীর মায়েরও মন খারাপ। উঠানে বসে চুপচাপ লাকড়ি কাটছে। মনা ভাই

ফিরলে কি নান্টুকে আবার জোর করে মোড়লের বাড়িতে রেখে আসবে? নান্টু যাবে না। সে মনা ভাইয়ের মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। গ্রামে এরকম অনেক কাউকে নান্টু চাচী ডাকে। আপন ভেবে তাদের সঙ্গে কত কথা বলে। নান্টু মনা ভাইয়ের মায়ের সাথে সে ভাবে কথা বলতে লাগল।

চাচী, আপনাদের মোড়লটা খুব শয়তান।

তুমি কেমনে বুঝলে বাবা?

মোড়লটা আপনাকে মিছেমিছি ভয় দেখাল। আব্বা তো মনা ভাইয়ে নামে কেস করবে না। মনা ভাই আমাকে বাড়িতে নিয়ে গেলে আব্বা মা খুব খুশি হবে। আব্বাকে বলে আমি মনা ভাইয়ের জন্য একটা ভাল জামা কিনে দেব।

তোমার আব্বা বুঝি খুব বড়লোক? আমাদের মোড়লের মতো?

শয়তান মোড়লের চেয়ে আব্বা তো অনেক বড়। ব্যাংকে তার অনেক টাকা আছে। আমাদের গোলায় কতো ধান, পাট। গরুও আছে অনেকগুলি।

সেই জন্যে তো আমাকে নিয়ে এত চিন্তায় পড়েছি বাবা। মোড়লের বাড়িতে থাকলে ভাল খেতে পারতে। আমরা যে গরিব মানুষ। নিজের চোখে তো দেখছ বাবা।

আপনারা এত গরিব কেন চাচী?

শোনো বাছার কথা! ধনী গরিব সব আল্লা বানায় বাবা।

কথাটা নান্টু বিশ্বাস করবে কিনা বুঝতে পারছে না। মানুষ অনেক টাকা রোজগার করলেই তো ধনী হয়। মনা ভাই টাকা রোজগারের বুদ্ধি জানে না বোধ হয়। এদের তরমুজ ক্ষেতে কত তরমুজ। সব বিক্রি করে টাকা জমাতে পারে। টাকা জমানোর জন্য মনা ভাই ঘরের খুঁটিতে ব্যাংক বানাবার বুদ্ধিও জানে না। নান্টু তাকে বুদ্ধিটা দেবে।

নূরী দূর থেকে নান্টুকে শুনিয়ে বলল, আমাদের অনেক জমি ছিল। নদী খেয়েছে। বাবা মারা যাওয়া পর মোড়ল আমাদের জমি নিয়েছে।

আমি বাড়িতে গেলে মোড়লের বিরুদ্ধে আব্বার কাছে বিচার দেব। দেখবেন কী বিচার করে।

মনার মা হাতের কাজ ফেলে নান্টুকে এসে জড়িয়ে ধরল। রাজপুত্তরের কথা শোনো। থাক বাবা, মোড়লের বিরুদ্ধে বিচার দিতে হবে না। তা হলে সে আমাদের আরো ক্ষতি করবে। চল বাবা, তোমাকে তরমুজ কেটে দেই।

চাচী, আমার ঐ হাঁড়িটা পেড়ে দেন তো দেখি।

মনার মা বেজায় খুশি হয়েছে। বাঁশের খুঁটিতে আটকানো হাঁড়িটা পেড়ে দিল। নান্টু দেখল, ভেতরে কুমির কদমা বাতাসা সব ঠিক আছে। কুমিটার মেঝেতে ছেড়ে দিল। নূরী ছুটে এল দেখার জন্য। নান্টু কয়েকটা বাতাসা বের করে প্রথমে চাচীর হাতে দিল। নিতে চায় না। জোরে করে গুঁজে দিল। নূরীর দিকেও দুটো এগিয়ে দিল। ফিক করে হেসে বাতাসা হাতে নিল নূরী। নান্টু এবার কুমিরের সুতাটা টেনে ছেড়ে দিল। হঠাৎ কাগজের কুমিরটা মাটিতে চলতে শুরু করলে, নূরী ও মাগো বলে সরে গেল। নূরীকে ভয় পেতে দেখে হাসি ফুটল নান্টুর মুখে।

বজরার চর গ্রামখানা দু'দিনে নান্টুর কাছে পুরনো হয়ে গেল। পুরনো জিনিস দেখতে তার একদম ভাল লাগে না। কিন্তু নদীটি যতবার দেখে, ততবারই নতুন মনে হয়। সব সময় নতুন নতুন স্রোত বইছে নদীতে। ঢেউগুলির ছুটে চলা দেখতে ভীষণ ভাল লাগে তার।

নদীটার দিকে তাকিয়ে নান্টুর বাড়ির কথা মনে পড়ে। ছোট নদীটা এঁকেবেঁকে বড় নদীতে গিয়ে মিশেছে। বড় নদী বড় রাস্তার মতো কত দূরদেশে চলে গেছে। নান্টুর পরিচিত তালতলা গ্রামের পাশ দিয়েও যদি নদীটা বয়ে যেত! নৌকায় চড়ে পাড়ের দিকে তাকিয়ে যেতে যেতে একদিন বাড়ি খুঁজে পেত নান্টু। কিন্তু নৌকায় চড়ে বাড়ি ফিরতে চাইলে নান্টু আরো দূরে হারিয়ে যাবে। ছোট নদীতে এমনি নামতেও তার ভয় হয়। নদীর খর স্রোত তাকে দূরে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

নদীর পাড়ের ছেলেমেয়েগুলির কী সাহস! ছোট নদীটা যেন তাদের খেলার মাঠ। যখন তখন লাফ দিয়ে নামে। স্রোত ঠেলে ঠেলে পার হয়। আবার শরীরটাকে নৌকা বানিয়ে স্রোতে ভেসে যায় বহুদূর।

নূরী ছাড়াও এ গ্রামের অনেক ছেলেমেয়ে এখন নান্টুকে চেনে। ওদের সঙ্গে নান্টু নদীতে নেমেছে। হাত দিয়ে মাছ ধরবে। হাঁটু-পানিতে বসে সবাই বালির ওপর কানার মতো মাছ হাতড়াচ্ছে। নূরী একটা চিংড়ি পেয়েছে। নান্টু একটাও পায়নি। তবে একটা ছোট মাছ তার হাতে কামড় দিয়ে পালিয়ে গেছে। মাছ না পেলেও অল্প পানির স্রোতে বসে মাছ ধরাটা খেলার মতো। ঢেউগুলি শরীরে কাতাকুতু দিয়ে পালিয়ে যায়। কোমর-সমান পানিতে দাঁড়ালে মনে হয় স্রোত তার কোমরটা কেটে দেবে।

আহা রে! আমার হাত ফস্কে একটা বড় মাছ পালিয়েছে।

কথাটা বলে একটি ছেলে, মাছের পিছু দৌড়াতে থাকল। তার সঙ্গে অন্যরাও। পানিতে ঝপ ঝপ শব্দ উঠছে। ভাটিতে পিছিয়ে স্রোতের মুখোমুখি আবার জালের মতো সার হয়ে বসল তারা। নান্টু ভাবল, এটা বুঝি মিছেমিছি মাছ ধরা খেলা। কিন্তু একটি ছেলে খেলতে খেলতে প্রায় এক হাত লম্বা একটি আইড় মাছ পেল। দু হাতে মাছটা ধরে সে পাড়ের দিকে ছুটে গেল। হাতের মধ্যেও সাদা মাছটা লেজ কাঁপাচ্ছে। পাড়ে ছেড়ে দিলে লাফাতে লাগল।

নূরী বলল, এই কাদের, মাছটা রাজপুত্তরকে দে। অন্য ছেলেমেয়েরাও দিতে বলল। কিন্তু কাদের তবু দোনোমনো করছে। কত কষ্ট করে মাছটা ধরেছে সে। বলল, বাড়িতে গিয়ে মাকে বলব। মা দিতে বললে দেব।

ফুলি নামের মেয়েটা বলল, কাদেরইরাটা যা হাড়কীপ্টা! চল আমরা নদীতে হাতড়াই। আবার একটা আইড় পেলে নান্টুকে দেব।

ঠিক এ সময় নান্টু দেখল, নদীর পাড় দিয়ে একটি সাইকেল আসছে। সাইকেলটা হাতে ঠেলে আনছে যে লোকটি, তাকে দেখে চমকে উঠল নান্টু। গণি ভাইয়ের মতো দেখতে। পরনে ফুলপ্যান্ট। কাছে আসতে বুঝল, গণি ভাই নয়। লোকটার গোঁফ রয়েছে।

এই ছেলেরা, মনার বাড়ি কোনটা?

ঐ কলাগাছওয়ালা বাড়িটা।

মনা কি মেলা থেকে একটা ছেলে ধরে এনেছে? ছেলেটার পরনে ফুলপ্যান্ট, গায়ে সুন্দর জামা, পায়ে জুতা। দেখেছ তোমরা?

সবাই নান্টুর দিকে তাকাল। কাদের নান্টুর গায়ে হাত দিয়ে দেখাল, এই ছেলে। নান্টুর পরনে ভেজা লুঙ্গি। গায়ে বালু।

তুমি! তোমার নাম নান্টু? বাড়ি তালতলা, বাপের নাম নওয়াব আলী সরকার?

নান্টু মাথা নাড়ল। বুক ধক ধক করতে লাগল তার। এই লোকটা তার সব খবর জানলো কিভাবে?

তোমার বাপ-মা খুঁজতে খুঁজতে পাগল হয়ে গেল। আর তুমি এই বজরার চরে নদীতে মনের সুখে মাছ ধরছ!

আমার আব্বা কোথায়?

আছে বাড়িতে। চল, তোমাকে আমি তোমার বাবা মায়ের কাছে পৌঁছে দেব।

ঠিক আছে। আপনি মনা ভাইয়ের বাড়িতে যান। আমি নদীতে গোসল করে আসছি।

লোকটা বলল, তোমাকে আর হাতছাড়া করছি না বাবা। বহু কষ্টে খুঁজে পেয়েছি। তাড়াতাড়ি গোসল করে আস।

নান্টু নদীটার কাছে শেষ বিদায় নেয়ার জন্য পানিতে গিয়ে নামল। কিন্তু নান্টু চলে যাবে বলে অন্য ছেলেমেয়েদের মন খারাপ। লোকটা এসে তাদের মাছ-ধরা খেলার আনন্দ নষ্ট করে দিয়েছে।

ফুলি বলল, নূরী তুই না বললি রাজপুত্তর তোদের বাড়িতে থাকবে। আর যাবে না। এখন যায় যে?

কাদের সাইকেলওয়ালা লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল, নূরী মাছটা নে। নান্টুকে আমি দিয়ে দিলাম।

নূরী মাছটা মাটিতে ছুড়ে দিল। তারপর একাই বাড়ির দিকে ছুটতে লাগল। সাইকেলওয়ালা লোকটা বলল, কত বড় মাছ! ঠিক আছে আমাকে দাও, আমি নান্টুর বাড়িতে নিয়ে যাব। ওর মা খুশি হয়ে দশ টাকা দেবে। সে টাকা আমি তোমাকে দিয়ে যাব।

নদী থেকে ফিরে নান্টু জামা-প্যান্ট পরতে লাগল। লোকটা বাইরে বসে আছে। মাছটা দড়ি দিয়ে বেঁধে সাইকেলে নিয়েছে সে। মাছটা দেখে মা নিশ্চয় খুশি হবে। নান্টু বলবে, নদীতে নিজে ধরেছে সে। নিজের হাতে না ধরলেও সবাই মিলে তারা ধরেছে। নকশি হাঁড়িটাও নেবে নান্টু। আর মাত্র কয়েকটা বাতাসা কদমা আছে। দেরিতে হলেও মেলার বাতাসা আজ মাকে খাওয়াতে পারবে নান্টু। কুমিরটা কি নূরীকে দিয়ে দেবে? এর মধ্যে কাগজের কুমির একটুখানি ছিঁড়ে গেছে। ওটা নূরীকে দিয়ে যাবে নান্টু।

নূরীর মা এসে জিজ্ঞেস করল, লোকটা কে? কী হয় তোমার?

নান্টু জবাব দিল, আমি চিনি না।

আগে দেখনি? তোমাদের গ্রামে বাড়ি?

না।

চেনা নেই, জানা নেই, তাহলে তোমাকে নিতে এসেছে কেন?

ও লোকটা তো আব্বাকে চেনে। আমাদের তারতলাও চেনে। সাইকেলে করে আমাকে সে বাড়িতে পৌঁছে দিতে পারবে।

তোমাকে বাড়ি পৌঁছাতে পারলে আমরাও তো বাঁচি বাবা। ঠিক আছে, তোমার মনা ভাই আসুক। ও নূরী, তোর ভাই মোড়লের ক্ষেতে কাজ করছে। ডেকে আন গিয়ে।

নূরী গাল ফুলিয়ে জবাব দিল, আমি পারব না।

নান্টু ভাবল, সে চলে যাচ্ছে দেখে নূরী রাগ করেছে। কুমিরটা পেলে তার রাগ পানি হবে। তাছাড়া মনা ভাই যাচ্ছে না তার সঙ্গে? নান্টুদের বাড়ি দেখার জন্য মনা ভাইয়ের খুব শখ। লোকটা নিশ্চয় সাইকেলে তাদের দু'জনকে নিয়ে চালাতে পারবে। নান্টু বসবে পেছনের কেরিয়ারে। মনা ভাই রাস্তা চিনলে, পরে নূরীকে নিয়ে সে তাদের বাড়ি যেতে পারবে।

জুতাটা পরে নিয়ে নান্টু নূরীকে বলল, চল আমিও যাচ্ছি। দুজনে গিয়ে মনা ভাইকে তাড়াতাড়ি ডেকে আনি।

বাড়ির পেছনের তরমুজ ক্ষেত পেরিয়ে দু'জন হাঁটতে লাগল। মেলায় আসার সময় নান্টুর যেমন খুশি লেগেছিল, বাড়িতে ফেরার সময়েও সেরকম খুশি লাগছে। নূরীকে খুশির ভাগ দেয়ার জন্যে সে বলেই ফেলল, কুমিরটা আমি তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি।

বিকেলে আমার সঙ্গে চরে কাশফুল তুলতে যাবে বলেছ। এখন যে চলে যাচ্ছ!

শুনলে না, মা আমার জন্য কাঁদছে। তুমি হারিয়ে গেলে তোমার মা কাঁদবে না?

ভাই তোমার জন্য হাট থেকে একটা হাফপ্যান্ট কিনে আনবে বলেছিল। কালকে হাট। আরো কদিন পরে ভাইয়ের সাথে তোমার দেশে যেও।

মনা ভাইও তো আমাদের সাথে যাচ্ছে।

ভাই গেলে কাম করবে কে? কাম বন্ধ হলে আমরা খাব কি? ভাইকে আমি যেতে দেব না।

নূরীটা আসলে বেশ ঝগড়ী। এভাবে কথা বললে তাকে ভাল লাগে না নান্টুর। কিন্তু যাওয়ার সময় নান্টু তাকে আর বকা দেবে না। চুপচাপ সে হাঁটতে লাগল।

মোড়লের বাড়ির সামনে একটা উঁচু পাটক্ষেত। সেখানে বসে কাজ করছিল মনা। সাথে আরো কয়েকজন কামলা। নান্টুকে নেয়ার জন্য লোক এসেছে শুনেই মনা ভাই খুশিতে উঠে দাঁড়াল। বলল, কী নান্টু ভাই। বলেছিলাম না বাড়ি থেকে একদিন তোমাকে নিতে লোক আসবে।

মনা ভাই, আপনিও চলেন।

ঠিক আছে তোমরা বাড়িতে যাও। আমি এখনই আসছি।

কোথাও যেতে হলে চুপচাপ যাওয়াই ভাল। সবাইকে বলতে গেলে ঝামেলা বাধে। যাত্রায় বিঘ্ন ঘটে। সে জন্যে মেলায় আসার সময় নান্টু শুধু মাকে বলেছিল। আব্বা এবং গ্রামের লোকজনকে বললে নান্টুকে আসতে দিত? কিন্তু আজ তো নান্টু দূরে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছে না। নিজের বাড়িতে ফিরে যাচ্ছে। তবু তাকে বিদায় দিতে এসে গ্রামের লোকজন ঝামেলা করছে। শুধু শুধু দেরি করিয়ে দিচ্ছে নান্টুকে। মাছটা সাইকেলে বেঁধে সেই কখন থেকে অপেক্ষা করছে লোকটা।

মনা ভাই নিজে যাবে না। নান্টুকেও যেতে না দেয়ার মতলব বুঝি তার মনে। সে জন্য ক্ষেত থেকে বাড়িতে ফিরে লোকটার সঙ্গে সে ঝগড়া বাধাল। মনা ভাই নাকি লোকটাকে চেনে। সুন্দরগঞ্জ হাটে একদিন দেখেছে। পাশের গাঁয়ের একটি ছেলেকে লোকটা মিথ্যে লোভ দেখিয়েছিল। চাকরি দেবে। বিদেশে পাঠাবে। এই লোক দেখিয়ে লোকটা ছেলেটার অনেক টাকা মেরে দিয়েছে।

মনা ভাইয়ের কথা শুনে লোকটা তো রেগে আগুন। বলল, না জেনে শুনে একজন ভদ্রলোককে দালাল বলছ। বাটপার ভাবছ। তোমার সাহস তো কম নয়!

মনা বলে দিল, নান্টু আপনার সাথে যাবে না। কারণ সে আপনাকে চেনে না।

লোকটা বলল, নান্টুর বাপ আমাকে চেনে। সে তার হারানো ছেলেকে খুঁজে বাড়ি পৌঁছে দিতে বলেছে আমাকে।

আগে নান্টুর বাবা আসুক। নান্টুর চেনাজানা কেউ আসুক। তার সঙ্গে নান্টু যাবে।

মনার চেয়েও লোকটার সাহস বেশি। রাগও বেশি। সে চেঁচিয়ে বলল, এত বড় সাহস তোমার। পরের ছেলেকে বাড়িতে আটকে রাখছ। আমি এক্ষুণি পুলিশ ডেকে আনব। জেলের ভাত খাওয়াব তোমাকে।

লোকটার সঙ্গে মনা ভাইয়ের ঝগড়া দেখার জন্য গ্রামের লোকজন ছুটে এল। শয়তান মোড়লটাও এল। সবাই নানারকম কথা বলতে লাগল। নান্টু পড়ল বিপদে। সে এখন কী করে?

নূরী তাকে ডেকে নিয়ে কানে কানে বুদ্ধি দিল। এই মানুষটা শয়তান। দেখ না, গোঁফটা শুধু দড়ির মতো পাকায়। ওর সাথে যেওনা তুমি।

তা হলে আমি কার সাথে বাড়ি যাব?

তোমার বাবা নিতে এলে যেও।

আব্বা কবে আসবে?

নান্টুকে এ প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে পারে না। সবাই শুধু শুধু গোলমাল করছে। লোকটার দোষ কি? সে তো নান্টুকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে চায়। আব্বাকেও চেনে। জামা-প্যান্ট পরেছে। এরকম পোশাকপরা ভদ্রলোক কি কখনও খারাপ হতে পারে? মনা ও তার পাজী বোনটা বরং খারাপ। নান্টুকে আটকে রেখে কষ্ট দিতে চায়।

মোড়লও মনাকে ধমক দিয়ে বলল, এই ভদ্রলোক যেই হোক, তাতে তোর কী? অজানা-অচেনা লোকের ছেলেকে বাড়িতে আটকে রাখতে চাস! মতলব কি তোর? দে, আপদ বিদায় করে দেয়। নইলে বিপদে পড়বি।

নান্টু এবার ঘোষণা করল, আমি এখানে আর থাকব না। বাড়িতে যাবো।

লোকটা বলল, এস বাবা নান্টু। সম্পর্কে আমি তোমার মামা হই। বাড়িতে গেলেই দেখবে তোমার আব্বা-আম্মা আমাকে কত খাতির করে। তারা সবাই আমাকে চেনে।

নান্টু আর কারো কাছে বিদায় চাইল না। অচেনা মামার সাইকেলের কাছে এগিয়ে গেল। মনা ঘর থেকে নান্টুর হাঁড়িটা এনে দিল। কিন্তু লোকটা হাঁড়ি কেড়ে নিয়ে মাটিতে আছাড় দিল। বলল, এসব ছোট লোকদের জিনিস নিতে হবে না।

হাঁড়ির মতো নান্টুর মনটাও ভেঙে খান খান হলো। কিন্তু তবু সে কাঁদল না। কদমা-বাতাসাগুলি মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছে। নান্টু কুড়িয়ে নিতে গেল না। সাইকেলে উঠে বসে বলল, তাড়াতাড়ি আমাকে বাড়িতে নিয়ে যান।

নূরী তার ভাইকে বলল, ভাই আমাদের ক্ষেতের একটা তরমুজ দাও। নান্টু বাড়ি নিয়ে যাবে বলেছিল।

লোকটা আবার ধমক দিয়ে বলল, থাক, আর দরদ দেখাতে হবে না।

সাইকেলের রডে বসে নান্টু দেখল, মনা ভাই ভাঙা হাঁড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে। হাঁড়িটা ভেঙে ফেলায় সে কি লোকটার ওপর রাগ করেছে? নান্টুর দিকে তাকাল এমনভাবে, যেন কেঁদে ফেলবে। নান্টু চোখ ফিরিয়ে নিল। তখন লোকটা জোরে সাইকেল চালাতে শুরু করল।

বজরার চর পেরিয়ে, অচেনা গ্রামের ভেতর দিয়ে সাইকেল ছুটতে লাগল। নান্টুর তবু তর সইছে না। সাইকেল পৌঁছবার আগে মন বার বার বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছে। নান্টুকে দেখে গ্রামের সবাই হৈ রৈ করে ছুটে আসবে। মা বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলবে। কাঁদতে কাঁদতে বলবে, কোথায় হারিয়ে গেছিলি তুই? কী জবাব দেবে নান্টু? সাইকেলে ঝোলানো মাছটা মায়ের হাতে দিয়ে হেসে বলবে, হারিয়ে যাইনি মা। আমি তো নদী থেকে তোমার জন্যে মাছ মেরে আনলাম।

নকশি হাঁড়িটা দেখলে মা আরো খুশি হতো। হাঁড়িটা ভেঙে ফেলার জন্য সে কি লোকটার বিরুদ্ধে বিচার দেবে? লোকটা হয়তো মনা ভাইকে দোষ দেবে। মনা ভাই তো রাগিয়ে দিয়েছে তাকে। গোলমালে দেরি না হলে এতক্ষণে তারা আরো অনেকটা পথ এগিয়ে থাকত।

মামা, আমার কখন বাড়ি পৌঁছব?

সন্ধ্যার মধ্যে পৌঁছে যাব।

সন্ধ্যা পর্যন্ত নান্টু কেবল বাড়িতে পৌঁছে যাওয়ার কথা ভাববে নাকি? তার চেয়ে রাস্তাটা ভাল করে চেনা দরকার। রাস্তা চেনা থাকলে, বড় হয়ে নান্টু একাই সাইকেল চালিয়ে মনা ভাইদের বাড়ি আসতে পারবে। আব্বা বলেছে, বড় হলে তাকে একটা মোটর সাইকেল কিনে দেবে। মোটর সাইকেলে চড়ে নান্টু যদি বজরার চরে আসে রাজপুত্তর নয়, সবাই বলবে রাজা এসেছে। রাজা এসেছে। নূরী নিশ্চয় খুশিতে তার মোটর সাইকেলে চড়ার বায়না ধরবে। নান্টু কি তাকে মোটর সাইকেলে চড়াবে?

সন্ধ্যা হয়ে এল, তালতলা গ্রামের নিশানা তবু চোখে পড়ছে না। লোকটা বলেছিল সন্ধ্যার মধ্যে তারা পৌঁছে যাবে। এদিকে সাইকেলে বসে থাকার কষ্ট আর সহ্য হয় না নান্টুর। অধৈর্য হয়ে সে আবার জিজ্ঞেস করল, মামা, আর কত দূর?

এই তো এসে গেছি। সামনে তালতলা।

নান্টু সামনে তাকিয়ে দেখল। একটি বাজার। দোকানগুলিতে বিজলী বাতি জ্বলছে। রাস্তাটাও এখানে পাকা হয়ে গেছে। ক্রিং ক্রিং শব্দে রিকশা আসছে একটা। তাদের গ্রামে যাওয়ার পথে এরকম বাজার জীবনেও দেখেনি নান্টু। লোকটা তাকে আরেকটা ভুল তালতলায় নিয়ে যাচ্ছে না তো? মনা ভাইয়ের তালতলায় তবু অনেক রকম গাছ ছিল। নান্টুদের গ্রামের মতো সেটা ছিল আরেকটা গ্রাম। কিন্তু এ জায়গাটা

ছোট শহরের মতন। আব্বার সাথে বাসে চড়ে নান্টু একবার শহরে গিয়েছিল। শহরের রাস্তায় হাজার হাজার রিকশা মোটর গাড়ি আর মানুষের ভিড়। নান্টু যেমন মেলার ভিড়ে হারিয়ে গেছে, শহরে তেমনি ছোট ছেলেরা খুব হারিয়ে যায়। গণি ভাইয়ের মতো বড় ছেলে পর্যন্ত ঢাকা শহরে একবার হারিয়ে গিয়েছিল। অনেক কষ্টে উদ্ধার পেয়েছে। নান্টু যদি নতুন করে এখানে হারিয়ে যায়! এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় হারিয়ে গেলে কে তাকে খুঁজে পাবে?

চারদিকে ভাল করে তাকিয়ে নান্টু জোর গলায় বলল, মামা আমাদের বাড়ি এ রাস্তা দিয়ে যায় না তো?

নান্টু লোকটাকে মামা ডাকছে। কিন্তু মামাটা গণি ভাই ও মনা ভাইয়ের মতো একটুও আদর করেনি তাকে। ধমক দিয়ে বলল, চুপ করে বসে থাক। রাস্তা-ঘাট অ মার চেয়ে বেশি চিনিস তুই?

নান্টুর বেশ ভয় করতে লাগল। আবার কথা বললে তাকে চড় দেবে বুঝি। এই অচেনা মামাটার এত রাগ কেন? তখন মেলার নকশি হাঁড়িটা আছাড় দিয়ে ভেঙে ফেলেছে। বাড়িতে গিয়েই নান্টু মাকে বলে দেবে ভেবেছিল। কিন্তু নান্টুকে নিয়ে সে কোথায় যাচ্ছে?

বাড়ি চেনার জন্য নান্টু চোখ বড় করে সামনে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ একটি ছোট পোকা তার চোখে এসে পড়ল।

সন্ধ্যাবেলা এরকম পোকা নান্টুর চোখে আগেও পড়েছিল। চোখ বন্ধ করে ছুটে মায়ের কাছে যেত সে। মা তার আঁচল দিয়ে পোকাটা বের করে দিত। কিন্তু এখন কে পোকা বের করে দেবে? নান্টু চোখ কচলাতে লাগল। চোখের খচখচ যন্ত্রণায় কেঁদে বলল, ও মামা, আমার চোখে পোকা পড়েছে।

লোকটা দাঁত খিঁচিয়ে জবাব দিল, পোকা পড়েছে তো কি হয়েছে! পোকা তো বাঘ না যে খেয়ে ফেলবে। চুপটি করে বসে থাক।

নান্টুর এত রাগ হলো যে, সে নিজেই হঠাৎ সাইকেলের ব্রেক কষে ধরল। পড়ে যেতে যেতে, পা নামিয়ে দিয়ে সাইকেল আটকাল লোকটা। সাইকেলে ঝোলানো মাছটা দুলতে লাগল। নান্টু লাফ গিয়ে সাইকেল থেকে নেমে বলল, আপনি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? আমি আপনার সাথে যাব না।

নান্টু এক চোখ হাত দিয়ে চেপে ধরে, আরেক চোখ দিয়ে দেখল, রাস্তার ধারে একটি দোকান। আলো জ্বলছে। সেখানে দাঁড়ানো একটি লোক বলল, সাইকেলটা এক্ষুণি এ্যাকসিডেন্ট করত। ছেলেটি কে?

নান্টু কিছু বলার আগে তার অচেনা মামা খুব আদর দেখিয়ে বলতে লাগল, ভাগ্নে, চোখে পোকা পড়েছে? এস দেখি বের করে দেই। এই তো আমার প্রায় এসে গেছি বাবা। সামনেই বাসা। সেখানে তোমার আব্বা অপেক্ষা করছে।

নান্টু চমকে উঠে বলল, আব্বা কোথায়?

সেখানেই তো তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। চল, চল, তাড়াতাড়ি।

নান্টু আবার সাইকেলে উঠে বসলে লোকটা জোরে সাইকেল চালাতে লাগল। পাকা রাস্তা ছেড়ে সাইকেলটা আবার অন্ধকারে ছুটে যাচ্ছে। নান্টু জিজ্ঞেস করল, আমার আব্বা কোথায় মামা? আপনার বাসায় আমাকে খুঁজতে এসেছে?

হ্যাঁ। তুমি তো খুব চালাক ছেলে। বলার আগে সব বুঝতে পারো। এখন লক্ষ্মী ছেলের মতো চুপচাপ বসে থাক।

চুপচাপ সাইকেলে বেশিক্ষণ বসে থাকতে হলো না নান্টুকে। লোকটা একটি ছোট বাড়ির সামনে সাইকেল থামাল। অন্ধকারে জায়গাটা একটুও চিনতে পারছে না নান্টু। লোকটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকতে লাগল, দোস্ত বাড়িতে আছো?

অচেনা মামার দোস্ত নান্টুর কাছে আরো বেশি অচেনা। তার মাথায় একটু টাক আছে। নান্টুকে দেখে বলল, দোস্ত এ মালটা কে? কোথায় পেলি?

আগে তাড়াতাড়ি ঘরে চল। তারপর সব বলছি।

ঘরে ঢুকে নান্টু তার আব্বাকে কোথাও দেখতে পেল না। এতক্ষণে বুঝতে পারল সে, অচেনা মামা আসলে ভীষণ মিথ্যেবাদী। খারাপ লোক। এটা তার নিজের বাড়ি নয়। নান্টুকে সে এখানে কেন নিয়ে এল? বোঝার আগে ভয়ে এবং রাগে তার বুকখানা ধকধক করতে লাগল। লোকটা দরজা বন্ধ করে দিতেই সে চেঁচিয়ে উঠল।

আমার আব্বা কোথায়? মিথ্যে কথা বললেন কেন? আমাকে এক্ষুণি বাড়িতে নিয়ে যান। না হলে কিন্তু....

মিথ্যেবাদী লোকটা রাগে কটকট করে তাকাল। ধমক দিয়ে বলল, মেরে হাড্ডি গুঁড়ো করে দেব তোর। চুপ। একদম চুপ।

নান্টু আরো জোরে চেঁচিয়ে বলল, না আমি চুপ করব না। মিথ্যে কথা বলে আমাকে কোথায় নিয়ে এলেন? আমি সবাইকে বলে দেব। আপনি মিথ্যুক। খারাপ লোক।

লোকটা যে এত খারাপ, নান্টু ভাবতে পারেনি। হঠাৎ সে নান্টুর গালে জোরে চড় কষে মারল। এত জোরে নান্টুকে কেউ আগে মারেনি। চড় খেয়ে সে বোবা হয়ে গেল। গালে হাত দিয়ে তাকিয়ে থাকল লোকটার দিকে।

সারাদিন তোর পেছনে অনেক খাটুনি গেছে আমার। এখন মুখে তালা দিয়ে এখানে দু'দিন থাক। তোর বাপ এসে আমার পাওনা টাকা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দিয়ে তোকে নিয়ে যাবে।

নান্টু এবার ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল। শয়তান লোকটা তার মুখ চেপে ধরল। আওয়াজ বন্ধ হলে হবে কি, নান্টুর কান্না ভেতরে ভেতরে ফুপিয়ে উঠছে। চোখের পানি দরদর করে লোকটার হাতে পড়ছে। মুখে গোঁগোঁ শব্দ নিয়ে নান্টু মাথা দোলাতে লাগল। হঠাৎ লোকটার হাতের আঙুল মুখের ভেতরে চলে আসায়, নান্টু তার আঙুলে মরণ-কামড় বসাল। ও বাবারে বলে, নান্টুকে ছেড়ে দিল লোকটা। তারপর একটা গামছা দিয়ে নান্টুর মুখ বাঁধল, হাতও বাঁধল। ধাক্কা মেরে ফেলে দিল ঘরের মেঝেতে।

ধরাশায়ী নান্টুকে দেখে বিজয়ী বীরের মতো হাসল লোকটা। তারপর দোস্তের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে লাগল।

বুঝলে দোস্ত, এমন বিচ্ছু ছেলে জীবনে আর দেখিনি। আমার আঙুলটা কেমন কামড়ে দিয়েছে দেখ। আর রাস্তায় চেঁচিয়ে লোক জড়ো করে সর্বনাশ করতে চেয়েছিল আমার। এখন চেঁচা দেখি।

নান্টুর মুখ নাক বাঁধা। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার। ময়লা গামছটার গন্ধ নাকে ঢুকছে। হাত দুটিও পেছনে বেঁধে রেখেছে। নান্টুর চোখ দুটি শুধু খোলা। মাটিতে কাত হয়ে পড়ে চোখ দিয়ে অবশ্য চিৎকার করছে সে। ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু আগুনের গোলার মতো ঝড়ে পড়ছে। কিন্তু নান্টুর কষ্ট দেখে শয়তানের খুশি যেন উপছে পড়ছে। বিছানায় বসে দুই দোস্ত সিগারেট টানতে টানতে গল্প করছে এখন।

দোস্ত লোকটি জানতে চাইল, বিচ্ছুটাকে কোথেকে ধরে আনলে? একে বেঁধে রেখে লাভ কত হবে?

বলব, সব বলব। আগে তোমার বউকে চা দিতে বল। বাজার থেকে একটা আইড় মাছ কিনে আনলাম। তোমার বউকে রাঁধতে বল। রাতে মজা করে খেয়ে হাজার টাকা রোজগারের প্লানটা পাকা পোক্ত করব দুজন মিলে।

টেকো-মাথা লোকটার হাঁক-ডাক শুনে পাশের ঘর থেকে একটি বউ এল। নান্টুকে অবাক চোখে দেখতে লাগল। মেলায় মাকড়সা-কন্যাকে দেখে মানুষ যেমন অবাক হয়, ভয় পায়, বউটিও যেন সেরকম ভয় পাচ্ছে। মাকড়সা কন্যার মাঝে বাক্সে আটকানো একটি ছোট মেয়ের মুখখানা শুধু দেখা যায়। কিন্তু নান্টুর তো পুরো মুখও দেখা যাচ্ছে না। বউটি ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল, এই ছেলে কে? বেঁধে রেখেছেন কেন?

শয়তান লোকটি হেসে জবাব দিল, এই আমাদের লাখ টাকার মাল। একে বেচা কেনা করে আমাদের অনেক টাকা লাভ হবে ভাবী। আপনিও ভাগ পাবেন।

কিন্তু মরে যায় যদি?

মরবে না। এই বিচ্ছুর জান অনেক শক্ত। কয়েক দিন একে ঘরে এভাবে বেঁধে রাখতে হবে। কেউ যেন টের না পায়।

সাইকেলে বাঁধা আইড় মাছটা এনে শয়তানটা বলল, বাজার থেকে আপনার জন্য ৫০ টাকা দিয়ে কিনে আনলাম। বেশি বেশি পেঁয়াজ দিয়ে রাঁধেন।

নান্টুর মুখ খোলা থাকলে প্রমাণ করে দিত, লোকটা কী ভীষণ মিথ্যেবাদী। এতক্ষণে সে বুঝতে পারছে, মনা ভাই এবং নূরী কেন এই ঠকের সঙ্গে তাকে আসতে দিতে চায়নি। নান্টুই তো জোর করে এসেছে। নিজের ভুলের জন্য এখন নতুন করে কান্না পাচ্ছে তার।

মাছ নিয়ে বউটা চলে যাওয়ার পর ঠক দুটি ফিসফিস করে গল্প করতে লাগল। নাক-মুখের মতো নান্টুর কানও গামছা দিয়ে বাঁধা। তবু ওদের কথা শোনার জন্য সে বাঁধা কানটা ওদের দিকে মেলে রাখল। কান্না থামিয়ে, ওদের শয়তানী বুদ্ধি দেখার জন্য ঘন ঘন তাকাতেও লাগল।

লোকটা আসলে নান্টুর আব্বা, নানা, মামা কাউকে চেনে না। দেখেওনি কোনোদিন। নান্টুদের বাড়ি আসলে তালতলা গ্রামে যায়নি কখনও। তবে কান্দির মেলায় গিয়েছিল। মেলায় জুয়া খেলে এক শো টাকা হেরে মন খারাপ হয়েছিল লোকটার। তখন মাইকে ঘোষণা শুনেছিল সে। নান্টু নামের দশ বছরের একটি ছেলে হারিয়ে গেছে। তার পরনে জামা ফুলপ্যান্ট পায়ে জুতা। কেউ তাকে খুঁজে পেলে মাকড়সা কন্যার তাঁবুতে পৌঁছে দেবেন। একশো টাকা পুরস্কার পাবেন। মাইকে হারানো সংবাদ শুনে লোকটা ভেবেছিল, ছেলেটিকে খুঁজে পেলে মন্দ হতো না। একশো টাকা লাভ হতো। কিন্তু কান্দির মেলায় হাজার হাজার ছেলে। তাদের মধ্যে কে নান্টু আর কে পিন্টু? খুঁজে পাওয়া কঠিন। হারানো নান্টুর কথা ভুলে গিয়ে তাই বাড়ি ফিরে গিয়েছিল সে।

পরদিন বাজারে চায়ের দোকানে গিয়ে লোকটা শুনল, সেই হারিয়ে যাওয়া নান্টুর কথা বলাবলি করছে সবাই। প্যান্ট-শার্ট পরা একটি জোয়ান ছেলে নান্টুকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার সাইকেলে চড়ে নান্টু মেলায় এসেছিল। ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করে নান্টুর সব খবর জেনে নিয়েছে লোকটা। ঠিকানাও লিখে নিয়েছে। নান্টুর বাবার নাম নওয়াব আলী সরকার। খুব ধনী লোক। একমাত্র ছেলে নান্টুকে কেউ খুঁজে দিতে পারলে সে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দেবে। এসব খবর দিয়ে নান্টুকে খুঁজতে আসা ছেলেটি কেঁদে ফেলেছিল। কারণ সেই তো নান্টুকে মেলা দেখাতে এনেছিল। নান্টুকে পাওয়া না গেলে সে আর গ্রামে মুখ দেখাতে পারবে না।

ঠক লোকটার গল্প শুনে নান্টু গণি ভাইকে মুহূর্তেই চিনতে পারল। গণি ভাই কি সাইকেলে চড়ে এখনো তাকে সব জায়গায় খুঁজে বেড়াচ্ছে? কিন্তু গণি ভাই বোকার মতো শয়তানটাকে তার নাম ঠিকানা বলে দিল কেন?

ঠকের দোস্তটাও আরেক ঠক। নান্টুর দিকে তাকিয়ে সে বলল, তারপর কিভাবে কোথায় খুঁজে পেলে?

লটারীতে জিতে মানুষ যেমন লাখ টাকা পায়, আমিও তেমনি ভাগ্যের জোরে পেয়ে গেলাম। তবে খুঁজতে হয়েছে অনেক। আমার পরিচিত তালতলা গ্রামে গিয়ে প্রথমে এর হদিস পাই। তারপর বজরার চরে গিয়ে খুঁজতে খুঁজতে দেখি, সোনার চাঁদ নদীতে গোসল করছে।

তারপর? তোমাকে ছেলেধরা সন্দেহ করেনি কেউ?

ওদের গল্প শুনে চমকে উঠল নান্টু। খারাপ লোকটাই তবে ছেলেধরা? এর আগে নান্টু ছেলেধরা দেখেনি কখনও। কিন্তু ছেলেধরার গল্প অনেক শুনেছে। মনা ভাইদের গ্রামে লোকটাকে যদি কেউ ছেলেধরা হিসেবে চিনিয়ে দিত, তাহলে কি নান্টু নিজেই ধরা দেয়? আবার শয়তান ছেলেধরাকে সে মামা ডেকেছে। অন্য লোকটাও কি ছেলেধরা? নইলে নান্টুকে ধরার গল্প মজা করে শুনছে কেন?

দেখ দেখ দোস্ত, ছেলেটা পিটপিট করে তাকিয়ে আমাদের সব কথা শুনছে। ভীষণ চালাক ছেলে।

নান্টু চোখ ফিরিয়ে নিল। সে যাতে শুনতে না পারে সে জন্য লোক দুটি এবার কানে কানে কথা বলতে লাগল। ওদের গোপন কথা শোনার জন্য নড়েচড়ে বসল নান্টু। নিঃশ্বাস বন্ধ করে কান পেতে রাখল কিছুক্ষণ। কিন্তু কোনো কথা শোনা যাচ্ছে না। শুধু ফিসফাস আওয়াজ। নান্টু আবার চোখ মেলে তাকিয়ে রইল। ওদের শয়তানী শলা-পরামর্শ স্পষ্ট সে দেখতে পাচ্ছে। নান্টুকে নিয়ে ওরা ভয়ঙ্কর খারাপ ফন্দি আঁটছে। তারপর ওরা কি তাকে মেরে ফেলবে? নান্টু শুনেছে, ছেলেধরা ধরলে হাত-পা ভেঙে নুলো করে দেয়। আবার বহু দূরে নিয়ে গিয়ে হাটে বাজারে বিক্রি করে দেয়। ভাবতেও নান্টুর বুক ধক ধক করে। ওদের হাত থেকে পালাবার জন্য সে এখন কী বুদ্ধি করে?

হঠাৎ নান্টুর মাথায় একটা বুদ্ধি এল। তার খুব পেশাব পেয়েছে। সাইকেলে চড়ে আসার সময় থেকে পেশাব চেপে রেখেছে সে। বদ মেজাজী মামাকে বলার সাহস এবং সুযোগ হয়নি। এখন নান্টু কী করে এদের পেশাব করার কথাটা বোঝায়? তা হলে নিশ্চয় পেশাব করার জন্য তাকে ওরা বাইরে যেতে দেবে। বাইরে গিয়েই নান্টু দেবে ভোঁ-দৌড়। তারপর চিৎকার করে মানুষকে বলে দেবে। আমাকে ছেলেধরা ধরেছে। বাঁচান। বাঁচান।

নান্টু বোবার মতো মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ তুলে ঘরের মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে লাগল। যেন সে এক্ষুণি মরে যাবে। লোক দুটি তার কাছে ছুটে এল। ধমক দিয়ে বলল, এই হারামীর ছা এমন করাছিস কেন? আবার চিল্লাহল্লা করলে তোর মুখ সেলাই করে দেব।

নান্টু গোঁ গোঁ আওয়াজ ছাড়াও, মাথা নেড়ে এবং চোখের মিনতি দিয়ে অনেক করে বোঝাতে লাগল, সে আর চিল্লাহল্লা করবে না। পেশার করার জন্য বাইরে যাবে। কিন্তু লোক দুটি তবু বুঝতে পারছে না। নান্টুর হাত খোলা থাকলে হাতখানা পেশাবের জায়গায় রেখে বুঝিয়ে দিতে পারত। ঠোঁট একটু ফাঁক করতে লাগল, হিস্‌স্‌ শব্দে করে বুঝিয়ে দিত যে, তার হিসি পেয়েছে। সে কেবল ছটফট করতে লাগল।

ঠকের দোস্তটি বলল, মুখ একটু খুলে দিয়ে শোনো কী বলতে চায়। মরেটরে গেলে আমাদের সব প্লান মাটি হবে।

ছেলেধরাটি বলল, ঠিক আছে, খুলে দিচ্ছি। কিন্তু আবার চেঁচালে মজাটা এক্ষুণি টের পাবি।

নান্টু বোকার মতো আর চেঁচাবে না। মুখের বাঁধনটা খুলে দিলে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগল।

কী রে! অমন করছিলি কেন?

নান্টু মিনিমিনে গলায় জবাব দিল, মামা! আমার নাক মুখ বেঁধে রাখলে আমি তো মরে যাব।

তা হলে আর কাঁদতে পারবি না। চিল্লাতেও পারবি না। যা বলি তাই শুনতে হবে। ঠিক আছে।

নান্টু ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়ল। লোকটা তখন তার হাতের বাঁধন খুলে দিল।

মামা, আমি পেশাব করব।

আচ্ছা, আয় আমার সঙ্গে।

লোকটা নান্টুর হাত ধরে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল। অন্ধকার উঠানে দাঁড় করিয়ে বলল, এখানে পেশাব কর। নান্টু চারদিকে তাকিয়ে দেখল। ঘুটঘুটে অন্ধকার। আকাশের তারাগুলি ছাড়া গোটা দেশ তার কাছে অচেনা। নান্টু কোন দিকে ছুটে পালাবে? আর পালাবেই বা কী করে? লোকটা তার হাত ধরে আছে যে।

মামা, প্যান্টের বোতাম খুলব তো। হাত ছেড়ে দেন। আমি পালাব না।

লোকটা হাত ছেড়ে দিয়ে নান্টুর পেছনে দাঁড়িয়ে থাকল। অন্ধকারে বসে পেশাব করার সময় নান্টু নতুন উপায় ভাবতে লাগল।

নিজেই লক্ষ্মী ছেলের মতো ছেলেধরাটার হাত ধরে ঘরে এল আবার। বলল, মামা, আমার আব্বার অনেক টাকা আছে। আমাকে বাড়িতে নিয়ে চলেন। আমি নিজেই আপনাকে অনেক টাকা দেব। মা খুশি হয়ে আপনাকে অনেক খাওয়াবে।

নান্টুর কথা শুনে লোক দুটি হো হো করে হেসে উঠল। তার মানে ওরা তার মিষ্টি কথা বিশ্বাস করতে পারছে না। নান্টু আল্লার কসম বলল। কিন্তু শয়তানরা আল্লাকেও বিশ্বাস করল না।

হেসে বলল, ঠগের ওপর বাটপারী করতে চাস! তা হবে না সোনার চাঁদ। তোর আব্বা আমাদের অনেক টাকা না দেওয়া পর্যন্ত তোকে বন্দী হয়ে থাকতে হবে। কাঁদলে আগের মতো মুখ বেঁধে রাখব।

আমি বাড়িতে গেলে আব্বা-মা খুশি হয়ে আপনাকে টাকা তো দেবেই।

কোনো চালাকি খাটবে না। এখন পরনের জামা জুতা খোল। এরকম পোশাক দেখলে লোকে সন্দেহ করবে। খোল বলছি।

ধমক খেয়ে নান্টু জুতা খুলল, জামা খুলল। ওরা তার ফুল প্যান্টটাও খুলতে বলল। কিন্তু ছেলেধরাদের সামনে ন্যাংটা হতে বুঝি লজ্জা করে না নান্টুর? সে প্রায় কেঁদে ফেলে বলল, আমি তাহলে কি পরব?

দোস্ত লোকটা অন্য ঘর থেকে নান্টুর জন্য একটা জাঙ্গিয়া প্যান্ট এনে দিল। ফুল প্যান্টটি খুলে সেই ময়লা জাঙ্গিয়াটি পরল নান্টু। তার জামা জুতা সব একটি পলিথিনের ব্যাগে ঢুকিয়ে লোকটা বলল, এগুলি আর তোকে পরতে হবে না। কাল এগুলি নিয়ে আমরা তোর বাড়িতে যাব। এসব দেখলে তোর বাবা-মা আমাদের সব কথা বিশ্বাস করবে।

তারপর কী হবে? বোঝার জন্য নান্টু ছেলেধরাদের দিকে তাকিয়ে থাকল। সে বাড়িতে যেতে পারবে না। দিনরাত ঘরে বন্দী হয়ে থাকতে হবে। ওদিকে মা নিশ্চয় রাস্তার দিকে তাকিয়ে শুধু কাঁদছে। ভাবতেই নান্টুর বুক ভেঙে যেতে লাগল।

এই ছোঁড়া, আবার কাঁদছিস কেন? মারব চড়।

নান্টু ভয় পেয়ে, চোখের পানি মুছে জবাব দিল, মামা, আমি কাঁদছি না। তখন চোখে পোকা পড়েছিল তো। সেই জন্য চোখ দিয়ে শুধু পানি বেরুচ্ছে।

ছেলেধরার সঙ্গে রাতে এক বিছানায় ঘুমাতে হবে। গোয়াল ঘরে গরুর পাশে ঘুমাতে হলে যেমন খারাপ লাগবে, তার চেয়েও বেশি খারাপ লাগছে নান্টুর। মনের ভেতরে ভয় এবং কষ্ট ধুকপুক করছে সারাক্ষণ।

ছেলেধরাটা তার দিকে পা মেলে দিয়ে বলল, তোকে সাইকেলে পনের মাইল কেরি করে গায়ে ব্যথা ধরে গেছে। পা টা টিপে দে।

কথা না শুনে নান্টুর উপায় নেই। যে কোনো সময় শয়তানটা তাকে চড় দিতে পারে। মারতে মারতে একদম মেরে ফেললেও কেউ তাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসবে না। নান্টু তাই বিছানায় উঠে বসে ছেলেধরার পা টিপতে লাগল। ভাল্লুকের মতো পা লোকটার। বড় বড় লোম। টিপতে গিয়ে নান্টুর ইচ্ছে করছে, জোরে জোরে ঘুষি খামছি দেয়। কিন্তু তাতে জানোয়ারটা আরো হিংস্র হয়ে উঠবে। তার চেয়ে এক কাজ করলে হয় না? ঘুমিয়ে গেলে নান্টু তাকে মেরে ভূত বানিয়ে দেবে। দরজার কাছে একটা কাঠ আছে। সেই কাঠ দিয়ে শয়তানটার মাথায় জোরে জোরে আঘাত করবে সে। কিন্তু ওরে বাবা রে মলাম রে—এসব বলে যদি চিৎকার দেয়? তা হলে পাশের ঘর থেকে তার দোস্ত ছুটে আসবে। তখন একা দু'জন শয়তানের সঙ্গে লড়তে পারবে নান্টু?

নান্টু অন্য উপায় ভাবতে লাগল। রাতে ঘুমাবে না সে। সকাল হওয়ার আগে এখানে থেকে পালাবার একটা বুদ্ধি খুঁজে বের করবে। হঠাৎ ট্রেনের গুমগুম আওয়াজ কানে আসতেই মাথায় একটা বুদ্ধি এল। ভাবল সে, নিশ্চয় এ জায়গাটার কাছাকাছি রেল লাইন আছে। রেল লাইনের ধারে আছে স্টেশন। নান্টু একবার ট্রেন দেখার জন্য সাইকেলে আব্বার সাথে কাউনিয়া স্টেশন গিয়েছিল। কাউনিয়া স্টেশনে সব ট্রেন থামে। রেল লাইন ঘুরে ঘুরে কাউনিয়া স্টেশন চলে গেছে। রেল লাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে নান্টু, একদিন না একদিন কাউনিয়া স্টেশনে খুঁজে পাবে। কারণ প্লাটফরমে বড় করে লেখা আছে স্টেশনের নাম। আর কাউনিয়া যেতে পারলে, লোকজনকে জিজ্ঞেস করে সে তাদের তালতলায় যেতে পারবে। নান্টুকে ডাকার জন্য যেন, ট্রেনখানা হুইসেল বাজিয়ে কাছাকাছি কোথাও থামল।

ছেলেধরার লোমশ পাখানা আস্তে সরিয়ে দিয়ে নান্টু বিছানার এক পাশে শুয়ে পড়ল। শয়তানটা কি ঘুমিয়ে পড়েছে? নান্টু টেপা বন্ধ করল। তবু কিছু বলছে না কেন? ঘুমন্ত মানুষের মতো জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে সে। নান্টু বেড়ালের মতো চুপি চুপি বিছানা থেকে নামল। ঘর অন্ধকার। হাতড়ে হাতড়ে দরজাটা খুঁজতে লাগল। লোকটার সাইকেলখানায় হাত লেগে একটু শব্দ হলো। তবু ধরা পড়ল না সে। অবশেষে দরজাটাও খুঁজে পেল নান্টু। দরজার খিলটা নিঃশব্দে খুলতে পারল। কিন্তু দরজাটা তবু খুলছে না কেন? ধাক্কা দিতেই শব্দ হলো, খটাস! আর তাতেই ঘুম ভেঙে গেল ছেলেধরার। ফস করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালল। নান্টুকে দেখতে পেল দরজার কাছে।

পাজী ছেলে পালাবি কোথায়? বাইরে থেকে দরজার তালা দিয়ে রেখেছি। বেশি চালাকি করলে পা ভেঙে দেব তোর।

না মামা, আমি পালাচ্ছি না। আমি হিসি করব।

তোর এত ঘনঘন হিসি পায় কেন রে বান্দর! নিচে দরজার ফুটো দিয়ে ছেড়ে দে।

নান্টু মিছিমিছি একটুখানি হিসি করে আবার বিছানায় উঠে এল। লোকটা নান্টুর গায়ে হাত-পা তুলে দিয়ে তাকে বেঁধে রাখল। নান্টুর ব্যথা লাগছে। গরমে ঘামছে সে। নাকে এসে লাগছে জানোয়ার লোকটার শরীরের দুর্গন্ধ। নান্টুর খুব রাগ হচ্ছে। কান্নাও পাচ্ছে তার। শয়তানটা আবার ঘুমিয়ে গেলে নান্টু এবার চিৎকার করে বাবা-মাকে ডাকবে।

তারপর নান্টু কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে, সে নিজেও জানে না। ঘুমিয়ে স্বপ্নে সে কিভাবে পালিয়ে বাড়ি পৌঁছে গেল, তাও মনে থাকে না। স্বপ্নে যখন সে মায়ের সাথে কথা বলছে, তখন তার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে দেখল, গায়ে ধাক্কা দিয়ে তাকে ডাকছে মা নয়, অন্য একটি বউ। নান্টু বিছানায় উঠে বসে ঘরের চারদিক তাকাল। মুহূর্তে মনে পড়ল রাতের সব কথা। এ মেয়েটি ছেলেধরার দোস্তের বউ। রাতে খেতে দেয়ার সময় নান্টুকে মাছের ছোট একটা টুকরা দিয়েছিল মাত্র। জিজ্ঞেস করেছিল, বাড়িতে তোমার বাবা-মা নেই? নান্টু শুধু মাথা ঝুঁকিয়ে হ্যাঁ বলেছিল। এখন বউটি এ ঘরে কেন? আর শয়তান ছেলেধরাটা কোথায়?

নান্টু জিজ্ঞেস করল, ওরা কই?

বউটি বলল, একটু বাইরে গেছে। ফিরে এসে তোমাকে নিয়ে যাবে।

কোথায় নিয়ে যাবে? আমাদের বাড়িতে?

না। অন্য এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে তোমাকে বন্দী করে রাখবে। কেউ জানবে না। দেখতেও পাবে না তোমাকে।

নান্টু ভাবল, বউটা তো ছেলেধরার দলের লোক। তাকে ভয় দেখাচ্ছে। আবার নান্টু যাতে পালাতে না পারে, সে জন্য বউটি তাকে পাহারা দিচ্ছে।

মিথ্যে কথা বলে আমাকে ধরে এনে বন্দী করে রাখবেন কেন? আমি কি দোষ করেছি?

নান্টুর কান্না মাখানো প্রশ্ন শুনে বউটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তারপর চাপা গলায় বলতে লাগল, এরা যে ভীষণ খারাপ লোক। খারাপ লোকদের টাকার লোভ খুব বেশি। টাকার

লোভে তারা শুধু মিথ্যে বলে না, তোমাকে মেরে ফেলতেও শয়তানদের বুক কাঁপবে না।

বউটি খারাপ লোকের বউ হলে হবে কি, খাঁটি কথা বলেছে। নান্টুর মনে পড়ল, মেলায় আসার আগে তারও টাকার নেশা হয়েছিল। টাকার লোভে সে মাকে মিথ্যে কথা বলেছে। চুরি করে হাটে পাট বিক্রি করেছে। আবার টাকার লোভে গণি ভাই মেলায় জুয়া খেলতে গিয়েছিল বলেই তো নান্টু হারিয়ে গেছে। তার হারিয়ে যাওয়ার দুঃখ কি বউটা বুঝতে পারছে?

নান্টু বলল, আমার মা খুব কাঁদবে।

বউটি বলল, এদের হাত থেকে পালাতে না পারলে তোমার কপালে আরো দুঃখ আছে। আমি ঘর থেকে বের করে দিচ্ছি, তুমি পালিয়ে যাও। এক্ষুণি।

বউটি কি তার সঙ্গে মজা করছে? পালাতে গেলেই হয়তো খপ করে ধরে ফেলবে। তারপর ছেলেধরা দুটিকে বলে দেবে। নান্টু তাই জিজ্ঞেস করল, কোথায় পালাব? আমি যে জায়গা চিনি না।

বউটি তাকে সাহস দিয়ে বলল, দুনিয়ার সবাই তো খারাপ না। অনেক ভাল মানুষও আছে। তারা তোমাকে তোমার বাবা-মায়ের কাছে পৌঁছে দেবে। ওরা ফিরে এসে তোমাকে না দেখলে হয়তো মারবে। আমি মার খেলে খাব, তবু তুমি পালাও।

আপনি খারাপ লোকদের সঙ্গে থাকেন কেন? আপনিও আমার সঙ্গে পালান তাহলে।

নান্টুর কথা শুনে বউটি তার মাথায় হাত রাখল। আদর করে বলল, আমার যে যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। তাছাড়া আমি মেয়ে। চাইলেও কি পালাতে পারি? তুমি যাও ভাই।

বউটাকে এতক্ষণে বিশ্বাস হলো নান্টুর। সে বিছানা থেকে লাফিয়ে নামল।

আমার জামা-প্যান্ট জুতা?

ওগুলো পরতে হবে না। বাড়িতে গেলে তোমার বাবা-মা আবার কিনে দেবে। এই পোশাকেই জলদি পালিয়ে যাও। বাজারের দিকে যাবে না। বাড়ির পেছনে দিক দিয়ে সরু রাস্তা ধরে দৌড়াতে থাক। আস আমার সাথে।

বউটি নান্টুর হাত ধরে বাইরে আনল। বাইরে যাওয়ার রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে বলল, আল্লা তোমাকে রক্ষা করুক। যাও ভাই। আল্লার নাম নিয়ে দৌড় দাও।

নান্টু বউটির কথা মতো আল্লার নাম নিয়ে দৌড় দিল। বাড়ির পেছনে একটা সরু রাস্তা, রাস্তার ধারে আরো কিছু ছোট ছোট বাড়ি। একটা বাড়ির সামনে দাঁত ব্রাশ করছিল একটি লোক। নান্টুকে দেখে জিজ্ঞেস করল, এই ছেলে দৌড়াস কেন? কে রে তুই? চোর নাকি?

জবাব না দিয়ে নান্টু আরো জোরে ছুটতে লাগল। রাতে জায়গাটা চিনতে পারেনি। এখন সকালের আলোয় সব কিছু দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু দেখার এবং চেনার সময় নেই তার। ডান দিকে তাদের গ্রামের মতো অনেক ফসলের ক্ষেত দেখা যাচ্ছে। নান্টু রাস্তা

ছেড়ে একটা ধান ক্ষেতে নামল। ক্ষেতের মাঝ দিয়ে দৌড়াতে লাগল। ছেলেধরাটা সাইকেল নিয়ে তাকে খুঁজতে বেরুলে ক্ষেতের মধ্যে আসতে পারবে না। সে জন্য নান্টু ফাঁকা ধানক্ষেত আর পাটক্ষেতের মাঝ দিয়ে ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে মনো ভাইয়ের কথা মনে পড়ল হঠাৎ। মনা ভাইয়ের সঙ্গে ক্ষেতে কাজ করত যে সব লোক, তারা সবাই নান্টুকে খাতির করত। এখন যদি ক্ষেতে কোনো লোককে কাজ করতে দেখে সে, তাকে সব বলে দেবে। কিন্তু সব ক্ষেত ফাঁকা।

ধু-ধু প্রান্তরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নান্টু হাঁপাতে লাগল, আর চারদিকে তাকাতে লাগল। ছেলেধরাদের বাড়ি থেকে অনেক দূর চলে এসেছে সে। পেছনে তাকিয়ে এখন বাড়িটা আর দেখা যাচ্ছে না। ডান দিকে তাকাতেই চমকে উঠল সে। টেলিগ্রাফের তার দেখা যাচ্ছে। তারের ওপর বসে আছে একটি লেজঝোলা পাখি নান্টু জানে, এরকম তারের পাশে রেললাইন থাকে। আর কিছুদূর এগোতেই রেললাইন চোখে পড়ল। এতক্ষণে যেন চেনা রাস্তা খুঁজে পেল সে। এক ছুটে রেললাইনের গিয়ে উঠল নান্টু।

রেললাইনটার একদিকে হাঁটলে সে কাউনিয়ার দিকে যাবে, অন্য দিকে হাঁটলে কাউনিয়া থেকে আরো দূরে চলে যাবে। নান্টু এখন কোন দিকে যায়? তাদের গ্রামে সকালে সূর্য নিয়ম অনুযায়ী পূর্ব দিকেই ওঠে। কিন্তু এ জায়গাটায় সূর্য উঠেছে যেন পশ্চিম দিকে। দিকভোলা হয়ে গেছে নান্টু। ছেলেধরার বউটা বলেছে, কোনো ভাল মানুষ নান্টুকে বাড়ি পৌঁছে দেবে। বউটার মতো একজন ভাল মানুষের খোঁজে সে হাঁটতে লাগল।

রেল-লাইনের মাঝখানে কাঠের স্লিপার এবং অসংখ্য পাথরের টুকরো। খালি পাথরের ওপর পা ফেলে হাঁটতে পারে না নান্টু। আবার দুই স্লিপারের মাঝখানে এত ফাঁক যে, নান্টুকে হাঁটতে হলেও লাফাতে হয়। লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগল সে। পেছনে শব্দ না করে কোনো ট্রেন ছুটে আসছে কি? নাকি ছেলেধরাটা খুঁজতে খুঁজতে পেছনে ছুটে আসছে? দেখার জন্য নান্টু মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাতে লাগল। ছেলেধরাটাকে দেখলে সে পাথর দিয়ে ঢিল দেবে। নান্টু দুটি পাথরের টুকরো হাতে কুড়িয়ে নিল। রেল-লাইনের ওপর কয়েকটা পাথরের টুকরো সাজানো দেখে চমকে উঠল সে। নিশ্চয় কোনো দুষ্টু ছেলের কাজ। ট্রেনের চাকার ঘষায় পাথরগুলি ছাতু বানাতে চায়। কিন্তু ট্রেন এসে যদি উল্টে পড়ে? নান্টু পা দিয়ে পাথরগুলি সরিয়ে দিল।

রেল-লাইন থেকে যেখানে আরেকটা লাইন বেরিয়ে দুটি রেল-লাইন হয়েছে, সেখানে পৌঁছে নান্টু সামনে একটা স্টেশন দেখতে পেল। স্টেশনের সামনে একটি মালট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। স্টেশনের কাউকে জিজ্ঞেস করলে নান্টু নিশ্চয় কাউনিয়া যাওয়ার উপায় খুঁজে পাবে।

স্টেশনে পৌঁছে দেখল, প্লাটফরমে অনেক লোক। কেউ বসে আছে, কেউ এমনি হাঁটাহাঁটি করছে। আবার কেউবা চায়ের দোকানে চা খাচ্ছে। স্টেশনে ঘরটার ওপাশে পাকা রাস্তা। সেখানে কয়েকটা রিকশা দাঁড়ানো। শয়তান ছেলেধরাটা যদি নান্টুকে খুঁজতে স্টেশনে চলে আসে? সে ভয়ে ভয়ে স্টেশনের লোকগুলিকে দেখতে লাগল। কিন্তু নান্টুর দিকে কেউ ফিরে তাকাচ্ছে না। নতুন জামা জুতা পরে মেলায় এলে কত

লোক তাকে তাকিয়ে দেখেছিল। জিজ্ঞেস করেছিল কত কথা। কিন্তু এখন তার দিকে কেউ তাকাচ্ছে না কেন? নান্টু নিজের দিকে তাকাল। গায়ে শুধু ময়লা গেঞ্জিটা। পরনের জাঙ্গিয়াটা বিশ্রী। এরকম খারাপ প্যান্ট সে কখনও পরেনি। এরচেয়ে লুঙ্গি পরলেও তাকে মানাত। পায়ে স্যান্ডেলও নেই। নিজেকে দেখতে ইচ্ছে করে নান্টুর। এরকম পচা ছেলের দিকে তাকাতে অন্য লোকদের বয়ে গেছে।

নান্টুর মতো একটি ছেলে প্লাটফরমের বেঞ্চিতে শোয়া একটি লোকের হাত-পা টিপে দিচ্ছে। ঐ লোকটাও ছেলেধরা নাকি? ছেলেটার কাছে হাত-পা মালিশ করে নিচ্ছে কেন? ছেলেটা নান্টুকে তাকিয়ে দেখছে। ভয়ে নান্টু অন্য দিকে হাঁটতে লাগল। স্টেশন ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে পেপার পড়ছে একটি ভদ্রলোক। তার পরনে প্যান্ট-শার্ট, হাতে ঘড়িও। এরকম পোশাক দেখে নান্টু গতকাল শয়তান ছেলেধরাটাকে ভদ্রলোক এবং ভাল মানুষ ভেবেছিল। এখন প্যান্ট-শার্ট পরা কোনো ভদ্র লোকের কাছে নিজের বিপদের কথা বলার সাহস হয় না তার। তবু পেপার-পড়া লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। নান্টুকে দেখে লোকটা তার ব্যাগ পায়ের কাছে টেনে নিল। ধমক দিয়ে বলল, এই, এখানে কী? ভাগ।

নান্টু মনা ভাইয়ের মতো একটি ভাল ছেলে খুঁজতে লাগল। নান্টুর চেয়ে সামান্য বড় একটি ছেলেকে চোখে ধরল তার। ছেলেটির হাতে জুতা-পালিশ করার বাক্স। প্লাটফমের ঘুরে ঘুরে সে সবার পায়ের দিকে তাকাচ্ছে। যাদের পায়ে জুতা, শুধু তাদের সাথে কথা বলছে ছেলেটি, পালিশ করাবেন স্যার? নান্টু নিজের জুতা জোড়ার কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

জুতা-পালিশ ছেলেটা কাছে আসতেই তাকে জিজ্ঞেস করল নান্টু, এই ভাই, আমি কাউনিয়া যাব কিভাবে?

ছেলেটি নান্টুর দিকে তাকিয়ে জবাব দিল, কাউনিয়া যাওয়ার লোকাল ট্রেন তো আসছে। দেখছিস না সিগানাল ডাউন হয়েছে? টিকেট মাস্টার টিকেট দিচ্ছে।

আমার যে টিকেট কাটার পয়সা নেই। আমি কিভাবে যাব ভাই?

তোর বাড়ি কোথায় রে?

নান্টু কি সব সত্যি কথা বলে দেবে? মনা ভাইয়ের মতো এই ছেলেটাও তাকে যদি আবার অন্য তালতলায় নিয়ে যায়? তাছাড়া ছেলেধরাদের বাড়িটা স্টেশন থেকে বেশি দূরে হবে না। ছেলেটা তাদের কাছে নান্টুর পালানোর খবর পৌঁছে দেয় যদি? ভেবে চিন্তে নান্টু জবাব দিল, কাউনিয়া গেলে আমি বাড়ি যেতে পারব।

জুতা পালিশওয়ালা যেন ট্রেনের মালিক। জোর গলায় বলল, তোর হাফ-টিকেটও লাগবে না। চেকার টিকেট চাইলে বলবি যে তুই ভিক্ষে করিস। না হলে বলবি, আমি কুলি।

ভিক্ষে করা বা কুলিগিরি করা কোনোটাই পছন্দ নয় নান্টুর। তার চেয়ে জুতা পালিশওয়ালা হওয়াই ভাল। সে তাই জবাব দিল, আমি তো ফকির না ভাই।

ঠিক আছে, তাহলে আমার সাথে থাক। আমাকে ট্রেনের টি টি চেনে। আমার সাথে থাকলে তোর টিকেট চাইবে না।

নান্টু ছেলেটার পিছু পিছু স্টেশনে ঘুরতে লাগল। হঠাৎ স্টেশনের পেছনের রাস্তায় চোখ পড়তেই চমকে উঠল সে। শয়তান ছেলেধরা এবং তার দোস্তটি রিকশা থেকে নামছে। নান্টু জুতা-পালিশ ছেলেটাকে কিছু না বলে, উল্টোদিকে দৌড় শুরু করল। কিন্তু কোথায় পালাবে সে? ভাবার সময় নেই। স্টেশনের ওয়েটিং রুমে ঢুকে পড়ল নান্টু।

ওয়েটিং রুমের বেঞ্চিতে বসে আছে কয়েকজন লোক। একটি বেঞ্চিতে কোলে বাচ্চা নিয়ে বোরখা পরা এক মহিলা বসে আছে। তার পাশে দাড়িওয়ালা একটি লোক। নান্টু তাদের পেছনে গিয়ে বেঞ্চির নিচে লুকাল। বুক টিপটিপ করছে তার। ছেলেধরা যদি এখানেও তাকে ধরতে আসে? চিৎকার করে সবাইকে বলে দেবে সে।

বেঞ্চিতে মায়ের কোলে বসা বাচ্চাটি হঠাৎ হিসি করে দিল। বেঞ্চের নিচেও বৃষ্টি দেখে নান্টু যখন সরে বসল, তখন বোরখাওয়ালীর চোখ পড়ল তার ওপর। বউটার বেশ লজ্জা। নিজে কিছু বলল না, পাশে বসা লোকটাকে টেনে দেখিয়ে দিল।

কে রে ওখানে? চুরি করার মতলব! বেরো হারামজাদা।

লোকটা নান্টুকে টেনে বের করে পিঠে চড় দিল একটা। আরো মার খাওয়ার ভয়ে কে কেঁদে বলল, আমি চোর না। ছেলেধরার ভয়ে পালিয়েছি। আমাকে ছেলেধরা ধরবে।

তোর মতো রাস্তার পোলাপানকে ছেলেধরা ধরে! মিথ্যেবাদী বাটপারটার কথা শোনেন ভাই!

দাড়িওয়ালার দাঁত-ভ্যাংচানো কথা শুনে, নান্টুর বেশ রাগ হলো। অন্য লোকগুলির দিকে তাকিয়ে জবাব দিল সে, আমি মিথ্যেবাদী বাটপার না। ভাল ছেলে।

একটি লোক হেসে বলল, মনে হয় পাগল। ছেড়ে দিন।

এ সময় বাইরে ট্রেনের শব্দ। ট্রেনে ওঠার জন্য লোকগুলি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে লাগল। নান্টুকে ছেড়ে দিয়ে লোকটা বোরখাওয়ালী বাউটার হাত ধরল।

নান্টু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখল। ছেলেধরাটা কোথাও নেই। ট্রেন প্লাটফরমে এসে দাঁড়িয়েছে। লোকজন উঠছে এবং নামছে। নান্টু ট্রেনে ওঠার জন্য দৌড় দিল।

ট্রেনখানা চলতে শুরু করলে নান্টুর ভয়ও কমতে লাগল। এখন আর ছেলেধরা তাকে খুঁজে পাবে না। ট্রেনে ওঠার পর দরজার দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছিল সে। এখন কামরাটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

এর আগে নান্টু ট্রেনে চড়েনি কোনোদিন। গণি ভাইয়ের কাছে ট্রেনের গল্প অনেক শুনেছে। ট্রেন চলতে থাকলে, আওয়াজটা নাকি বলতে থাকে, ঢাকা যেতে কতক্ষণ! ঢাকা যেতে কতক্ষণ! কিন্তু এ ট্রেনখানার আওয়াজ যেন বলছে, বাড়ি যেতে কতক্ষণ! বাড়ি যেতে কতক্ষণ! সত্যি কি সে একা বাড়ি যেতে পারবে? বাড়িতে পৌছতে পারলে নান্টু একা একা ট্রেন-ভ্রমণের গল্প শুনিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দেবে।

গণি ভাইয়ের কাছে গল্প শুনে ভেবেছিল, চলন্ত ট্রেনে বুঝি মানুষ এমনি এমনি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। নান্টু দাঁড়িয়ে ছিল। সবার জায়গা নেই। সিট পেলেও সে বসত না। কারণ তার টিকেট নেই। বসলে যদি কেউ নামিয়ে দেয়? নান্টু তাই ভয়ে ভয়ে দুই সিটের মাঝখানের কোণে গিয়ে দাঁড়াল। ট্রেনের গায়ে হেলান দিয়ে চারদিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

এক জায়গায় লেখা আছে ২১ জন বসিবেক। নান্টু গুণে দেখল, ভুল করে ২৮ জন বসেছে। এরা কি লেখাটা পড়েনি? দাঁড়ানোর কথা অবশ্য কিছু লেখা নেই। তাই অনেক মানুষ ভিড় করে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। খোলা দরজার কাছেও দাঁড়িয়ে আছে মানুষ। বাতাসে একজনের চুল জামা পতপত করে উড়ছে। নান্টু ভয়ে দরজা থেকে সরে এসে ভাল করেছে। ভিড়ের ধাক্কায় নিচে পড়লে আলুভর্তা হয়ে যেত সে। নান্টুকে দেখে তখন অন্য ছেলেরা বলত, রেলগাড়ি ঝমঝম, পা পিছলে আলুর দাম। এক কোন চলে আসায় নান্টুর আর পড়ে যাওয়ার ভয় নেই। তার দাঁড়াবার জায়গাটাতেও বসার সিটের মতো আরাম।

নান্টু সিটের বসা লোকগুলিকে ভাল করে দেখতে লাগল। তার ডান দিকে বসে আছে চশমা পরা এক মহিলা। তার দুটি ছেলে। বড়টি মনে হয় ক্লাস ওয়ান কি টু-তে পড়ে। নান্টুর চেয়েও ছোট। বাবা-মার সাথে ট্রেনে চড়ে সিটে বসেছে বলে ওর খুব ডাট। নান্টুকে একবার বলেছিল, এই ছেলে! এখানে দাঁড়ালি কেন? নান্টু জবাব দেয়নি। নিজের গ্রাম তালতলা হলে উচিত জবাব দিত।

ছেলেটি এখনও মাঝে মাঝে কটমট করে নান্টুর দিকে তাকাচ্ছে। ওর ছোট ভাইটি বরং ভাল। মায়ের পিঠ ধরে খোলা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটি একবার মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, মা বাইরে গাছগুলি ছুটে যাচ্ছে কেন? তার মা জবাব দিয়েছে, ট্রেন থেকে দেখলে ওরকম মনে হয়। আসলে গাছ কি ছুটতে পারে? ছোট ছেলেটা বুঝি বিশ্বাস করেনি। তাই ভাল করে তাকিয়ে দেখছে। সোঁ সোঁ করে বাতাস আসছে ভেতরে। ছেলেটি সেই বাতাস মুখের ভেতর নিচ্ছে আর চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে। ছেলেটির বাতাস খাওয়ার দৃশ্য দেখে হাসি পায় নান্টুর। কিন্তু হাসল না সে। কারণ মেলায় কেনা বাতাসার হাঁড়ি ভাঙার কথা মনে পড়ে মন খারাপ হয়ে গেল তার। তাছাড়া নান্টুর বেশ খিদেও পেয়েছে।

এত বাতাস খেয়েও ছেলেটির পেট ভরেনি। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, মা খিদে পেয়েছে। পাউরুটি-কলা দাও।

মাহিলাটি ব্যাগ থেকে কলা-পাউরুটি বের করল। দুই ছেলে এবং তাদের বাবাকেও ভাগ করে দিল। নিজেও একটি কলা ছিলে খেতে লাগল। ওদের রুটি-কলা খাওয়া দেখে নান্টুর পেটের খিদে জিভে উঠে এল। খিদেটা তাকে ভিখিরি সাজার বুদ্ধি দিচ্ছে। জুতা পালিশওয়ালা ছেলেটি যেমন দিয়েছিল। ওদের খাওয়া না দেখার জন্য নান্টু খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল।

বাড়িতে পৌঁছতে পারলে সে যা খুশি, যত খুশি খেতে পারবে। কিন্তু এসব নতুন জায়গা কি জীবনে দেখতে পাবে? মা তাকে একা হাটে যেতে দিত না। আর এখন

একা একা কত নতুন জায়গা দেখতে পাচ্ছে নান্টু। লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে বড় বড় লোকগুলিও হাঁ করে ট্রেন দেখছে। আর নান্টু সেই ট্রেনের ভেতরে চড়ে ছুটে যাচ্ছে।

এই ছেলে, নে রুটি-কলা খা।

নান্টু মাথা ঘুরিয়ে দেখল, ছোট ছেলের দাঁত বসানো অর্ধেক কলা আর ছেঁড়া এঁটো রুটি লোকটা তার দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। মাথা নেড়ে না বলল সে। বড় ছেলেটি বলল, ফেলে দিলে তো এখন তুলে চেটে চুটে খাবি।

নান্টু আর রাগ চেপে রাখতে পারল না। বলল, আমি অতো ফকির না। ক্লাস থ্রিতে পড়ি। কারো এঁটো জিনিস কখনো খাই না।

এবারে ট্রেনের যাত্রীরা অনেকে নান্টুর দিকে তাকাল। লোকটি হাতের এঁটো কলা-রুটি বাইরে ছুড়ে দিল। চশমা পড়া বউটি আস্ত একটা কলা আর এক পিচ রুটি এগিয়ে দিল।

নাও বাবা, তোমাকে আদর করে দেওয়া হচ্ছে।

নান্টু দু'বার না না বলেও হাত বাড়িয়ে নিল। লোকটা হেসে বলল, ফকির না, কিন্তু পুরোটা দিলে নেয়।

লোকটা এবং তার কথা শুনে যারা হাসছে, তাদের কারো দিকে তাকাতে ইচ্ছে করছে না নান্টুর। বড় বড় মানুষগুলি এরকম বেয়াদব কেন? ছোট মানুষের মনে কষ্ট দিয়ে ওরা মজা পায়। আবার নির্লজ্জের মতো হাসেও। সে কি সাধ করে জামা জুতা না পড়ে ট্রেনে চড়েছে? তখন স্টেশনে লোকগুলিকে নান্টু ছেলেধরার কথা বলল। কেউ বিশ্বাস করেনি। দাড়িওয়ালা লোকটি তাকে চোর ভেবে মারল পর্যন্ত। ভাল জামা-কাপড় না পরলেই মানুষ কি চোর হয়? ফকির হয়? মনা ভাই নূরীরা কি চোর, না ফকির? ট্রেনের লোকগুলির কাছে নান্টু তার হারিয়ে যাওয়ার কাহিনী বলবে না। কারো সাহায্য লাগবে না তার। একা একাই বাড়ি যাবে সে।

ট্রেন একটি স্টেশনে থামতে নান্টু চঞ্চল হয়ে উঠল। সবাইকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, এটা কোন স্টেশন? আমি কাউনিয়া যাব।

একজন জবাব দিল, চুপ করে বসে থাক। কাউনিয়া আরো তিন স্টেশন পরে।

নান্টু জানালা দিয়ে তাকিয়ে স্টেশনের নাম খুঁজতে লাগল। ট্রেন যদি কাউনিয়া ছেড়ে চলে যায়, তা হলে সে আবার হারিয়ে যাবে। বাড়ি যাওয়ার রাস্তা খুঁজে পাবে না। ট্রেন ছাড়ার সময় কামরার মধ্যে যে লোকটি উঠল, তাকে দেখে চমকে উঠল সে। পরনে সাদা কোট প্যান্ট। মাথায় হ্যাট। সবার কাছে টিকেট দেখতে চাইছে সে। নান্টুর কাছেও নিশ্চয় চাইবে। কী জবাব দেবে সে? সত্যি কথা বললে তো আর বিশ্বাস করবে না। নিজেকে ফকির কিংবা কুলিও বলতে পারবে না নান্টু।

চোর না, তবু যেন চুরি করে ধরা পড়েছে সে। শাস্তি পাওয়ার ভয়ে নান্টুর বুক কাঁপতে লাগল। লোকটার হাত থেকে এখন কোথায় পালায় সে? নান্টু মাথা খাটিয়ে একটা বুদ্ধি বের করল। কামরার মেঝেতে বসে পড়ল সে। তারপর ট্রেনের দেয়ালে হেলান দিয়ে নান্টু ঘুমিয়ে পড়ল। টিকেট চেকার কামরা থেকে না নামা পর্যন্ত ঘুম থেকে উঠবে না সে।

পরের স্টেশনে ট্রেন থামারও কিছুক্ষণ পর চোখ খুলল নান্টু। চেকারটি নেমে গেছে। ঘুমন্ত নান্টুর কাছে টিকেট চায়নি। উঠে দাঁড়িয়ে সে আবার স্টেশনের নাম খুঁজতে লাগল।

আরো দুটি স্টেশন পার হওয়ার পর, ট্রেনখানা বড় স্টেশনে ঢোকার সময় নান্টু নিজের চোখে দেখতে পেল, প্লাটফরমে বড় করে লেখা কাউনিয়া জং। খুশির ঘণ্টা নান্টুর বুকে ঢং ঢং বেজে উঠল। আব্বার সঙ্গে সাইকেলে চড়ে এই স্টেশনে সে এসেছিল একবার। এখান থেকে মাত্র সাত/আট মাইল দূরে তাদের তালতলা গ্রাম। হেঁটে গেলেও সন্ধ্যার আগে সে বাড়ি পৌঁছতে পারবে।

ট্রেন থেকে নেমে, স্টেশন পেরিয়ে নান্টু সামনে যাকে দেখে, তাকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, তালতলা যাব কোন রাস্তা দিয়ে? কেউ বলল, জানিনা, কেউ বলল সোজা, কেউ বলল যেতে হবে মধুপুর দিয়ে। আরেক জনকে জিজ্ঞেস করতেই সে তালতলার আশপাশের গ্রামের নামগুলি পর্যন্ত ঠিক বলতে পারল। নান্টুর বাবার নাম জানতে চাইল। তারপর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল কোন রাস্তা দিয়ে যেতে হবে।

নান্টু খুব জোরে হাঁটতে লাগল। অনেক নতুন জায়গা দেখেছে সে। অনেক নতুন মানুষকে চিনেছে। নান্টু তার অতি পরিচিত তালতলা গ্রাম ছাড়া নতুন কোনো জায়গা দেখতে চায় না। বাবা-মাকে ছাড়া নতুন মানুষকে আর চিনতেও চায় না। সে কোনো দিক না তাকিয়ে, কারো মুখ না দেখে রাস্তা দিয়ে ছুটে চলল।

একটি সাইকেল নান্টুর সামনে এসে থামল হঠাৎ।

লোকটা অবাক হয়ে বলল, এই ছেলে কোথায় ছুটে যাচ্ছ? আরে! তুমি আমাদের সরকার সাহেবের ছেলে নান্টু না?

নান্টু লোকটাকে চিনতে পারল। নাম জানে না। কিন্তু বাড়ির কাছারি ঘরে আব্বার সঙ্গে বসে অনেক দিন গল্প করেছে। নান্টু নিজেই একদিন লোকটাকে চা দিয়েছিল।

কোথা থেকে এলে তুমি বাবা? এদিকে তোমার বাবা পাগলের মতো সবখানে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আস, আস সাইকেলে উঠে বস। আমি আর কাউনিয়া যাব না। তোমাকে আগে বাড়িতে দিয়ে আসি।

নান্টু লোকটার সাইকেলে উঠে বসল। গণি ভাইয়ের চেয়েও জোরে সাইকেল চালাতে লাগল লোকটা।

অনেক অচেনা গ্রাম পেছনে পড়ে যাচ্ছে। নান্টু তাকিয়ে আছে সামনে তার চেনা গ্রামটি দেখার জন্য। অনেক আঁকাবাঁকা পথে পেছনে চলে যাচ্ছে। তবু সামনের পথটুকু

যেন শেষ হতে চায় না। বিকেল হয়ে এল। আর কিছুক্ষণ পর মাকে দেখবে সে। সাইকেলখানা বাঁক ঘুরতেই তালতলা গ্রামের সীমানায় চেনা বড় গাছটি প্রথম নজরে এল। চোখের পলক ফেলতে ভুলে গেল সে। চোখে মুখে হাসি ফুটল তার। চারদিক তাকতে লাগল। যেন এত সুন্দর জায়গা জীবনেও দেখেনি।

বাড়িতে পৌঁছার আগে হারানো নান্টুর ফিরে আসার খবর গোটা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। তালতলার আকাশ, বাতাস, মানুষ, গাছপালা, পশুপাখি সবাই যেন খুশি হয়ে উঠেছে নান্টুকে দেখে। সাইকেলের পিছু পিছু, কেউ বা সাইকেলের আগে ছুটে গেছে নান্টুদের বাড়ি। তার বাবা-মাকে খবর দেয়ার জন্য।

বাড়ির প্রাঙ্গণে নান্টু যখন সাইকেল থেকে নামল, তাকে ঘিরে ধরল গাঁয়ের চেনাজানা লোকজন। রব ও কুদ্দুস ভিড় ঠেলে সামনে এসে দাঁড়াল। হায়, হায়! নান্টুর নতুন জামা-প্যান্ট কই? কোথায় হারিয়ে গেছিলি তুই? এ মানুষটার সাইকেলে চড়ে এখন কোথা থেকে এলি? এমনি নানারকম প্রশ্ন করতে লাগল সবাই। কিন্তু নান্টু কোনো জবাব দিচ্ছে না। বাড়িতে ফিরে আসতে পারার খুশিতেও তার কান্না পাচ্ছে। ভিড়ের মধ্যে মা ও বাবাকে খুঁজছে তার চোখ।

হারিয়ে যাওয়ার পর নান্টু যত কষ্ট পেয়েছিল, মা কষ্ট পেয়েছে আরো বেশি। মায়ের কান্না ও ছুটে আসা দেখে নান্টুরও চোখ ফেটে পানি এল। মা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞেস করল, সোনা-মানিক আমার। তোর এ দশা হয়েছে কেন?

আব্বা তো মায়ের মতো সহজে কাঁদে না। নান্টুকে দেখে খুশিতে চেঁচিয়ে সাইকেলওয়ালা লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, কোথায় পেলেন একে? আমি তো আজো সারাদিন খুঁজে এলাম। গণি শয়তান ফেরেনি এখনো? আপনি নান্টুর হদিশ পেলেন কি ভাবে?

লোকটাকে তো নান্টু তার হারিয়ে যাওয়ার গল্প কিছুই বলেনি। আব্বাকে প্রথম বলল শুধু, আব্বা, আমাকে ছেলেধরা ধরেছিল। জামা-জুতা কেড়ে নিয়েছে। পালিয়ে আমি ট্রেনে এসেছি। একদম একা। টিকেট লাগেনি।

এইটুকু শুনেই সবাই তাজ্জব। চোখ বড় করে নান্টুর দিকে তাকিয়ে থাকল, আর প্রশ্ন করতে লাগল নানা রকম। নান্টু কার উত্তর আগে দেয়? আব্বা সবাইকে থামিয়ে দিয়ে ঘোষণা করল, ছেলেধরার খোঁজ পরে হবে। আগে আমাদের লাল দামরা গরুটা বের করে জবাই করো। যারা নান্টুকে খুঁজে বেড়িয়েছে, সবাইকে দাওয়াত দাও। রাতে বাড়িতে মজলিশ হবে।

মজলিশী খাওয়া-দাওয়া হবে শুনে খুশিতে সবাইক বকবক করতে লাগল। নান্টুর মনে পড়ল, মনা ভাই ও নূরীদের কথা। আহা, ওরা এলে কত মজা হতো!

মা আঁচলে চোখের পানি মুছে, মুচকি হেসে এবার নান্টুকে জিজ্ঞেস করল, মেলা দেখার শখ মিটেছে তোর?

নান্টু জবাব দিল, শুধু মেলা নয় মা। আরো মেলা কিছু দেখেছি আমি। সব বলতে গেলে দশ বছর সময় লাগবে।

সেকেন্ডারি এডুকেশান কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (SEQAEP) এর
পাঠ্যাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য মুদ্রিত।
বিক্রির জন্য নয়